February 2017 issue
A Literary Webzine in Bengali
ঈশানকোণ
www.ishankon.com
Editor: Sadananda Singha

I S HANKON A LI TERARY WEBZI NE I N BENGALI

বইমেলা সংখ্যা ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ইং

সম্পাদকঃ সদানন্দ সিংহ

গল্প

প্রদীপ সরকার, তনিমা হাজরা, য়ুমলেম্বম ইবোমচা, নীহার চক্রবর্তী, সদানন্দ সিংহ, বৈদুর্য্য সরকার

গল্পাণু

যুগান্তর মিত্র, তৃষ্ণা বসাক, সদানন্দ সিংহ, ব্রতীন বসু, বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী

মুক্তগদ্য

নকুল রায়, অরুণিমা চক্রবর্তী, নির্মাল্য কুমার মুখোপাধ্যায়

নিবন্ধ

অশোকানন্দ রায়বর্ধন, সদানন্দ সিংহ

ইদানীং অন্যান্য

আলোচনা, লেখাজমা, কিছুকথা

ছড়া

শঙ্কর দেবনাথ, দেবীস্মিতা দেব, শ্রীয়া ঘোষ সেন

কবিতা

নকুল রায়, দিশারী মুখোপাধ্যায়, কল্যাণব্রত চক্রবর্তী, তৈমুর খান, তুষ্টি ভট্টাচার্য, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, দিলীপ দাস, উৎস রায়চৌধুরী, চয়ন ভৌমিক, মাধব বণিক, বনানী ভট্টাচার্য, রুদ্রশংকর, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, কৃত্তিবাস চক্রবর্তী, লক্ষ্মণ বণিক, সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণিমা চৌধুরী, নীপবীথি ভৌমিক, প্রণব বসুরায়, সদানন্দ সিংহ, অজিতা চৌধুরী, অঞ্জন বর্মন, সমিত ভৌমিক, নীতা বিশ্বাস, শুভেশ চৌধুরী, চিরশ্রী দেবনাথ, আশুতোষ রানা, কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়, অপাংশু দেবনাথ, সুবীর ঘোষ, শর্মিষ্ঠা পাল, পিয়ালী বসু, কুমারেশ তিওয়ারী, মলয় মজুমদার, অভ্রদীপ দত্ত, দেবাশিস সাহা, ব্রতীন বসু, ইন্দ্রজিৎ দত্ত, অরিন্দম ভাদুড়ী, সন্তোষ রায়

ওয়েব ডিজাইনঃ সদানন্দ সিংহ

কবিতা গল্প অণুগল্প ছড়া নিবন্ধ সাক্ষাৎকার অনুবাদ সাহিত্য বইপত্রের আলোচনা ইত্যাদি নিয়েই ঈশানকোণ ওয়েবজিন। বছরে চারবার ঈশানকোণ প্রকাশিত হবে। প্রকাশকালের সম্ভাব্য মাস হচ্ছে ফেব্রুয়ারি, মে, অগাস্ট এবং নভেম্বর মাস। সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

কিছু কথা

এক

একদিন নিজের উপর আপনার নিজেরই হয়তো বিরক্তি লাগতে পারে। কারণ আপনি নিজেকে নিয়ে কখনই একশ শতাংশ সন্তুষ্ট নন। আপনার নিজের অনেক কাজ হয়তো আপনারই পছন্দ না। আপনার হয়তো মানসিক তৃপ্তি নেই। হয়তো বা শারীরিক তৃপ্তিও। আপনার মেজাজ হয়তো খিটখিটে। আপনার হয়তো কাঁদতে ইচ্ছে করছে। আপনার হয়তো রাগ করতে ইচ্ছে করছে, কিছু ভাঙচুর করতে ইচ্ছে করছে। হয়তো আপনি আহ্লাদে আটখানা, ধেই ধেই নাচতে ইচ্ছে করছে। কোন কোন সময় হয়তো স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে করছে। হয়তো কাউকে ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। এইসবকিছুই আপনি করতে পারেন কিংবা না করেও দিব্যি আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন, কারণ আপনি একজন মানুষ এবং আপনার মন বলে একটা জিনিস আছে। এবং যেটা আপনি পারেন না বেঁচে থাকতে থাকতে সেটা হল নিজেকে ঘৃণা। কারণ আপনি নিজেকে ভালোবাসেন। আপনি হয়তো পৃথিবীর অনেক উপকার করেন, হয়তো অনেক সৃষ্টিশীল কাজে নিযুক্ত আছেন। এ হেন আপনাকে কেউ একজন বললো, ইডিয়ট। আপনার খুব রাগ হবে নিশ্চয়ই। আপনি তাকে হয়তো একটা থাপ্পড় লাগালেন। লোকটা মাটিতে পড়ে গেল। তারপর মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়েই আবার বললো, ইডিয়ট ইডিয়ট। আপনি আবার থাপ্পড় লাগালেন। লোকটা আবার পড়ে গেল, ঠোঁট ফেটে রক্ত বেরুতে লাগল। ঐ অবস্থায় লোকটা বলতে থাকলো, ইডিয়ট ইডিয়ট ইডিয়ট। এইবার আপনি বুঝে গেলেন, লোকটার অন্য ক্ষমতাই নেই। ক্ষমতা বলতে শুধু তার মুখটাই। তখন আপনি নিজেই হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। কারণ আপনার ওপর ‘‘অ্যাটেম্প্ট টু মার্ডার’’ –এর খাঁড়া ঝুলতে পারে। তারপরে আপনি তাকে আর পাত্তাই দেবেননা, লোকটাকে সাইকো হিসেবেই ধরে নেবেন। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখবেন এই লোকটা আপনার কোনো ক্ষতি করেনি। সে হয়তো আপনাকে কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে, সে হয়তো ঠিকমতো আপনাকে বোঝাতে পারেনি। তারপরেও আপনাকে এসে অন্য কেউ বলতে পারে, ইডিয়ট ইডিয়ট ইডিয়ট ইডিয়ট। যে লোকটা চারবার ইডিয়ট বললো তাকে আপনি এবার ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন, লোকটা বিরাট ক্ষমতাশালী। আপনি তখন তাকে থাপ্পড়ও দিতে পারবেন না। কারণ তাতে আপনার বিনাশ হবার একশ শতাংশ সম্ভাবনা। তখন কেউ কেউ পুঙ্গির ভাইয়ের মন্তব্য বলে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করে থাকবেন। কেউ কেউ ব্লাড প্রেসার নিয়ে একটা কম্প্রোমাইজ করার রাস্তায় হাঁটতে থাকবেন। আর কেউ কেউ রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে নেমে যাবেন। আর কেউ কেউ প্রতিবাদের ভাষা খুঁজতে থাকবেন সাহিত্য-শিল্পকলায়। এই প্রতিবাদের ভাষাটাই এখন খুব কম দেখা যায়। এখন দেখি প্রায় অনেকেই নিজেকে নিয়ে খুব ব্যস্ত। অনেককেই দেখছি বসন্ত বিলাপ বা প্রলাপে মত্ত। যেন এটা একটা ডিজিটালাইজড্ ফিভার।

দুই

অনেক পরিকল্পনাই শেষপর্যন্ত বাস্তবায়িত করা যায়না। এটা বিফলতাই। পারিপার্শ্বিক অনেক কারণই সেজন্যে দায়ী। তাই কিছু নিয়মিত বিভাগ এবারে দেয়া যায়নি।

তিন

যাঁরা যাঁরা ঈশানকোণ-এর মাধ্যমে ই-বুক বের করতে চান, তাঁরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এই ই-বুকগুলি ঈশানকোণ-এর সাইটে দেয়া থাকবে ডাউনলোডের জন্যে। ইতিমধ্যেই আমরা একটা করেছি এবং সেটা দেওয়া আছে ডাউনলোড লিংকে।

নি ব ন্ধ

অ শো কা ন ন্দ রা য় ব র্ধ ন

ত্রি পু রা র লো ক কা হি নিঃ মৌ খি ক প্র ত্ন ক থা র বি শ্ব জ নী ন রূ প

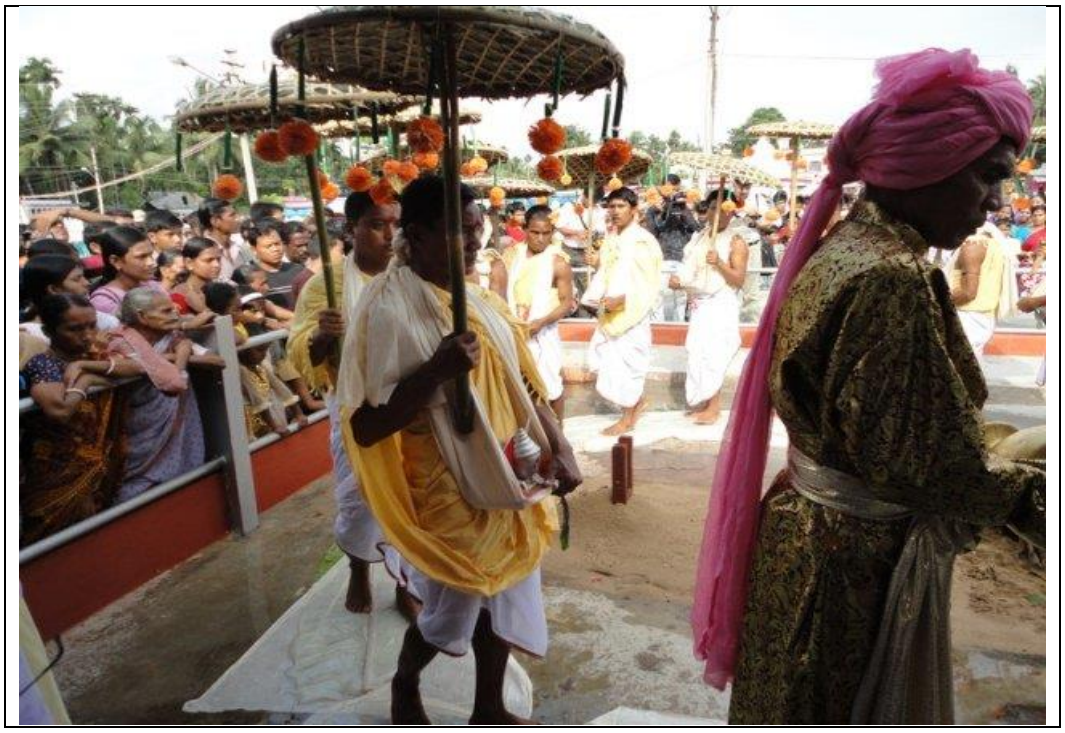

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

(তি ন)

ত্রিপুরার লোককাহিনিগুলোর বিশ্বজনীন রূপ পর্যবেক্ষণ করতে হলে কাহিনিগুলোর মটিফ বিচার-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। স্টিফ থমসন বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত কাহিনি টাইপ থেকে মটিফ সূচি তৈরি করেছেন। ইংরেজি বর্ণমালার আদ্যক্ষর দিয়ে তিনি মটিফগুলো চিহ্নিত করেছেন। মটিফসূচিতে পুরাণ কাহিনি থেকে শুরু করে অতীন্দ্রিয় কাহিনি পর্যন্ত উল্লিখিত হয়েছে। সেই ত্রিপুরার লোককাহিনিগুলোতেও পৌরাণিকতামূলক (A); জীবজন্তুবিষয়ক (B); আনুষ্ঠানিক নিষেধ সম্পর্কিত (C); ভয়ংকর বিষয়ক (G); পরীক্ষাসংক্রান্ত (H); চালাক ও মূর্খ সংক্রান্ত (j); ভাগ্যবিপর্যয়মূলক (l); পুরস্কার ও শাস্তি বিষয়ক (Q); যৌনসংক্রান্ত (T); ধর্ম-উপদেশমূলক (V); বিবিধ বিষয়ক(Z) এইসমস্ত মটিফ লক্ষ্য করা যায়। এখানে ত্রিপুরার দুটি লোককাহিনির মটিফ বিশ্লেষণ করে দেখা হচ্ছে।

১ বীর জামিছলঙ

কাহিনি সংক্ষেপঃ জামিছলঙ পাহাড়ি ত্রিপুরার একজন বীর। তার গায়ে ভীষণ জোর। সে বনে গিয়ে ঘর তৈরি করার জন্য একঝাড় বাঁশ কেটে ঘাড়ে করে আনতে পারে। এক ঘরের যত খুঁটি লাগে, একসঙ্গে সব আনতে পারে। একটা আস্ত শূকর খেয়ে ফেলতে পারে। তার একদিন দুনিয়া ঘুরে দেখার সাধ হল। সে বেরিয়ে পড়ল। অনেকদূরে সে দেখল নির্জন জায়গায় একটা লোক খুব ছোটো ছোটো পাহাড়ি মাছির পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বের করছে। জামিছলঙ অবাক হলে লোকটা জানায়, তার চেয়ে আরও বড়ো বীর জামিছলঙ। জামিছলঙ নিজের পরিচয় গোপন করে। দুজনে জামিছলঙের খুঁজে বেরিয়ে পড়ে। অনেক পথ যাওয়ার পর দুজনে পাহাড়ের উপর থেকে একটা নদী দেখতে পায়। নদীর কাছে গিয়ে তারা দেখতে পায়, একজন লোক নিজের শরীর দিয়ে পাহাড়ি নদীর জল আটকাচ্ছে। সেও বলে যে তার চেয়ে বড়ো বীর জামিছলঙ। এবার তিনজনই একত্রে জামিছলঙকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে।

হাঁটতে হাঁটতে তারা পৌঁছে যায় একটা টিলার ওপর। টিলার ওপর একটা সুন্দর বাড়ি দেখতে পায়। কিন্তু ঘরে কেউ নেই। তাদের খিদে পায়। জামিছলঙ রান্নার আয়োজন করে। অন্য দুজন বনমোরগ ধরে আনতে বেরিয়ে যায়। এমন সময় মায়াবিনী রাক্ষসী আসে। এটা তার বাড়ি। অনুমতি ছাড়া বাড়িতে ঢুকে পড়ায় রাক্ষসী তাকে আক্রমণ করে। রাক্ষসী তার মাথায় গদা দিয়ে আক্রমণ করে, কিন্তু তার উপলব্ধিই হয় না। রাক্ষসী আরও রেগে যায়। দুজনের মধ্যে লড়াই চলতে থাকে। রাক্ষসী গদা ছেড়ে গাছ উপড়ে আক্রমণ করে। জামিছলঙও আরেকটা গাছ উপড়ে আক্রমণ করে। এমন সময় জামিছলঙের সঙ্গীরা বনমোরগ নিয়ে বন থেকে ফেরে। তারা ভীষণ লড়াই দেখে অবাক হয়। জামিছলঙ রাক্ষসীকে মেরে ফেলে। সঙ্গী দুজন জামিছলঙের পরিচয় জানতে চায়। জামিছলঙ তার পরিচয় দেয়। তখন সবাই মিলে আনন্দ করে।
কাহিনিতে উপস্থিত বিভিন্ন মটিফ। স্টিথ টমসন কৃত মটিফ ইন্ডেক্স অনুযায়ী তার মূল বিভাগগুলো নিচে উল্লিখিত হল। সহায়ক তথ্যের অভাবে প্রতিটি বিভাগের সঠিক উপবিভাগ বিশ্লেষণ করা সম্ভব হল না। তবুও এ থেকে কাহিনিতে প্রবাহিত মূল মটিফগুলোর পরিচয় পেতে কোনও অসুবিধা হবে না।

মটিফসূচি

১. পাহাড়ি ত্রিপুরায় জামিছলঙ ছিল একজন বীর – বীর (Z)
২. একঝাড় বাঁশ কাটতে পারা; এক ঘরের প্রয়োজনীয় খুঁটি বইতে পারা; একটা আস্ত শূয়োর খেয়ে ফেলতে পারা – চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (W

৩. ‘ইয়ংখা’ (এক রকমের বুনো মাছি) মাছির পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বের করা – অপূর্ব পারদর্শিতা (H)
৪. শরীর দিয়ে পাহাড়ি নদীর জল আটকানো – অপূর্ব পারদর্শিতা (H)
৫. গভীর জঙ্গলে টিলার উপর বাড়ি – অত্যদ্ভুত ঘটনা (F)
৬. রাক্ষসী – ভয়ঙ্কর প্রাণী (G)
৭. মায়াবিনী – ঐন্দ্রজালিকতা (D)
৮. গদার আঘাতে যন্ত্রণা বোধ করা – পৌরুষের পরীক্ষা (H)
৯. জামিছলঙ-এর শক্তিমত্তার পরিচয় – অসম শক্তিশালী পুরুষ (F)

2 ভাইবোন হাতি হয়ে গেল

কাহিনি সংক্ষেপঃ ত্রিপুরার পাহাড়ি জুমিয়া পরিবার। দুই ভাইবোন। দুজনের বিয়ের বয়স হয়েছে। গ্রামের যুবক-যুবতীদের বিবাহ সংক্রান্ত আলোচনা করে জুমে মা-বাবাকে সাহায্য করতে যায়। ধানের বোঝা নিয়ে বাড়ির পথ ধরে। মা সাবধান করে, বাড়ি যেতে যেতে দুপুর হবে; টিলার নিচে যে দুটো কুয়ো আছে, তার বামদিকেরটায় যেন স্নান না করে, ডানদিকেরটায় করে। ওরা কুয়োর কাছে এসে পড়ে। পরিশ্রান্ত হয়ে বিশ্রাম করে। স্নানের ইচ্ছে হয় ওদের। ছোটোবোন বাঁদিকের কুয়োয় স্নান করতে যায়। দাদা বারণ করে। শেষপর্যন্ত সেখানেই স্নান করে দুজনে। শরীর অস্বাভাবিকভাবে ফুলে যায়। হাতি হয়ে যায় দুজনে। সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে মা তাদের দেখতে না পেয়ে কুয়োর পাশে আসে। জঙ্গলে হাতিরূপী ভাইবোনদের দেখতে পায়। বাড়ি নিয়ে যায়। সবাই তাদের জড়িয়ে ধরে শোক করে। পরদিন তাদের বিদায় জানানো হয়। মা তাদের বলে, আগুনকে তোমরা ভয় কোরো, তীরকে তোমরা ভয় কোরো, কলাগাছ বেছে বেছে ছাড়িয়ে নিয়ে খেয়ো। ওরা চোখের জল ফেলতে ফেলতে জঙ্গলে যায়। কথিত আছে, সেইদিন থেকে হাতি আগুন, তীরকে ভয় পায়। কলাগাছ বেছে বেছে আছড়ে খায়।

মটিফসূচি

১ ভাইবোন দুজনের বিয়ের বয়স হয়েছে। গ্রামের কোন ছেলে-মেয়ের বিয়ে হবে আলোচনা – যৌনসংক্রান্ত (T)
২ দুটো কুয়োর মধ্যে বামেরটায় স্নান না করার মায়ের নিষেধ – বাধানিষেধ (C)

৩ মায়ের নিষেধ না মেনে বাম কুয়োয় স্নান – ট্যাবু ভাঙা (C)
৪ ভাইবোনের হাতিতে রূপান্তর – ট্যাবু ভাঙার জন্যে রূপান্তর (D)
৫ হাতিরূপী ভাইবোনকে জড়িয়ে ধরে কান্না – মানুষের সঙ্গে জীবজন্তুর সম্পর্ক (B)
৬ বিদায়ী ভাইবোনদের (রূপান্তরিত হাতিদের) চোখ দিয়ে জল পড়া – মানবিক গুণসম্পন্ন জীবজন্তু (B)
৭ কথিত আছে সেইদিন থেকে হাতি আগুন, আগ্নেয়াস্ত্র, তীরকে ভয় পায় আর কলাগাছ বেছে বেছে আছড়ে খায় – জীবজন্তুর বৈশিষ্ট্য। লোকপুরাণ (A)

এক-একটি লোককথাকে বিশ্লেষণ করলে এরকমভাবে তার মধ্যে এক বা একাধিক কাহিনি বা অণুকাহিনি পাওয়া যায়। এগুলিই হল মটিফ। এই মটিফসূচিকরণের মধ্য দিয়েই একটি কাহিনির মধ্যে সর্বজনীন বা বিশ্বজনীন অভিপ্রায়টি জেগে উঠে। ত্রিপুরার লোককাহিনি সমূহকেও এরকমভাবে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে বিশ্বের লোককথার অন্তর্নিহিত অভিন্নতার বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সেদিক দিয়ে বিশ্লেষণ করলে ত্রিপুরার লোককথা সমূহও একাধারে আঞ্চলিক অন্যদিকে বিশ্বজনীন। প্রমাণিত হয় যে লোকসমাজের মন ভৌগোলিক রাজনৈতিক বেড়াজালে আটকে রাখা যায় না। কালের প্রবাহে তা একস্থান থেকে অন্যস্থানে লোকসমাজের মনের গভীরে প্রবেশ করে।
লোককথাসমূহ যেহেতু প্রাচীন, সে কারণে লোককাহিনিতে প্রাচীন মানবজীবন, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন তথ্য থাকে। একটা জাতির অনেক অজানা ইতিহাস লোককাহিনি থেকে উদঘাটিত হয়। ত্রিপুরার লোককথা সমূহকে বিশ্লেষণ করলেও এই ধরণের অজানা অনেক তথ্য বেরিয়ে আসে। প্রাচীন ত্রিপুরার জীবনযাত্রা যে জুমকেন্দ্রিক ছিল তার বিশদ বিবরণ বিভিন্ন লোককাহিনিতে রয়েছে। ফসল উৎপাদন করতে যে পরিশ্রম হত, তাও এই লোককথাসমূহ থেকে জানা যায়। উৎসব অনুষ্ঠানে মদ্যপানের রেওয়াজ ছিল। সমাজে মহিলাদের প্রাধান্য ছিল বা প্রাচীন ত্রিপুরা সমাজে মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু ছিল। তারও বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়, যখন দেখি বিভিন্ন লোককাহিনিতে সামাজিক দায়িত্ব বা নির্দেশ দানের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নিচ্ছে মেয়েরা। ‘কলম্পাকন্যা’, ‘খুমবারতি’, ‘ছেলেরছা’ গল্পে প্রধান পুরুষটিকে মহিলারাই বিভিন্ন নির্দেশ দিয়ে সমস্যা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। সেকালের নারীদের প্রখর বুদ্ধিমত্তার কাহিনিও এথেকে প্রকাশ পায়। তখনকার সময়ে যে বহূবিবাহের প্রচলন ছিল, সে তথ্য জানতে পারা যায় ‘ইঁদুরসর্দার’ গল্পে ইঁদুরের চার পত্নী গ্রহণের মাধ্যমে। এ গল্পে সগোত্রের বাইরেও যে অনেক জীবিকা নির্বাহ করত, তার বর্ণনাও আছে ‘জামিছলঙ’ এবং ‘সোনার পাখি’ গল্পে। ‘সোনার পাখি’ গল্পে আদিবাসী নিয়ম-কানুনের কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে, গ্রামের সর্দারের আদেশে ‘ছুকাল’ বা ডাইনি সন্দেহে অনেককেই মেরে ফেলা হয়েছে। ‘ছেলেরছা’-এর মাও অলৌকিক কান্ডকারখানা দেখে

সন্দেহ করেছে কলসির মাছটা বুঝি ডাইনি। অর্থাৎ সেকালে ত্রিপুরী জনজীবনে ডাইনিচর্চচাও যে ছিল, তারও একটা খন্ডচিত্র এইসব লোককাহিনিতে পাওয়া যায়। রাজপুরুষদের পরনারীর প্রতি লোভ এবং দরিদ্র প্রজার দুর্ভোগের কাহিনিও জানতে পারা যায় ত্রিপুরী লোককথা অবলম্বনে। 'খুমবারতি'-কে রাজার 'বিনন্দিয়ারা' জোর করে হাতির পিঠে তুলে নিয়ে গিয়ে রাজার সঙ্গে বিয়ে দেয়। বৃদ্ধ পিতা পথে পথে ঘোরে। ঠিক তেমনি 'ছেলেরছা'-র বউয়ের প্রতি আকৃষ্ট হলে রাজা এবং রাজার 'বিনন্দিয়া'রা অর্থাৎ রাজকর্মচারীরা বিভিন্ন কৌশল করে ছেলেরছা-কে বাজিতে পরাজিত করে তার স্ত্রীকে দখল করতে চায়। বউয়ের বুদ্ধিমত্তাই ছেলেরছাকে রক্ষা করে।

সামাজিক জীবনে দারিদ্র্যের ছাপই প্রকট হয়ে ওঠে বিভিন্ন লোককাহিনিতে। বেশির ভাগ আদিবাসী জুমিয়া বনের বাঁশ বেতের উপর নির্ভর করত। সে হিসেবে বাঁশ ব্যাপারীও ত্রিপুরী লোকগল্পের চরিত্র হিসেবে দেখা দিয়েছে (বিগ্রাছা)। সৎমার ঈর্ষাকাতরতাও লোককাহিনির একটি প্রধান মটিফ। ত্রিপুরার লোককাহিনিতেও এই চিত্র বর্তমান। 'বাতাসনামা'-তে সৎমায়ের যন্ত্রণা এবং সতীনকন্যার ভাগ্য পরিবর্তনে ঈর্ষাকাতরতা লক্ষণীয়।

পৃথিবীর সকল লোককাহিনিতে পশুর উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি। আসলে পশুর চরিত্রগুলি মানব চরিত্রেরই প্রকাশ। সামাজিক শালীনতা বা অনুশাসনের কারণে সরাসরি লোকচরিত্র উদঘাটন না করে তখনকার দিনে পশুকে রূপক করে কাহিনিসমূহ প্রকাশ করা হত। পশুচরিত্রগুলি মূলত মানবিক গুণ সম্পন্ন। কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী মহাশয়ের সংগৃহীত 'ভাইবোন হাতি হয়ে গেল'; 'বাঘ ও শিয়ালের গল্প'; 'নুয়াই রাজা';'মুরগীর পিঠে বানানোর গল্প'; 'ইঁদুর সর্দার' ইত্যাদি গল্পের পশুপাখির চরিত্র মানবিক গুণসম্পন্ন। প্রাচীনকালে পশুকাহিনির মাধ্যমে লোকশিক্ষা প্রদানের উদাহারণ আমরা পঞ্চতন্ত্র, জাতক ইত্যাদিতে পাই। ত্রিপুরার লোককাহিনিতেও এরূপ কাহিনি লোকশিক্ষারই বাহন।

ত্রিপুরার লোককাহিনির উপর বিস্তৃত গবেষণা আজও হয়নি। যদি এই ক্ষেত্রে যথাযথ মনোনিবেশ করা যায়, তাহলে এই লোককাহিনিসমূহ বিশ্লেষণ করে ত্রিপুরী জাতির অনেক অবলুপ্ত ইতিহাস এবং হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যের পুনর্নির্মান করা সম্ভব হবে। যে জাতির অল্প সংখ্যক প্রাপ্ত লোককথায় এতসমস্ত বৈচিত্র্যের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, সে জাতি যে একসময় গৌরবোজ্জ্বল জীবন অতিক্রম করেছে সে কথা অনস্বীকার্য। কালস্রোতে তা হারিয়ে যাওয়ার আজ প্রমাণসাপেক্ষ।

[সমাপ্ত]

গ্রন্থঋণ

১ ফোকলোর চর্চার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি – মহারুল ইসলাম। লোক-লৌকিক প্রকাশনী, কোলকাতা।
২ পুরাকথার স্বরূপ – শংকর বসুমল্লিক ও গৌরী ভট্টাচার্য। বেস্ট বুকস, কোলকাতা।
৩ আদিবাসী লোককথা – দিব্যজ্যোতি মজুমদার। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কোলকাতা।
৪ লোকপুরাণ ও সংস্কৃতি – ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত সম্পাদিত। পুস্তক বিপণি, কোলকাতা।
৫ লোকসমাজ ও পশুকথা – দিব্যজ্যোতি মজুমদার। লোক-লৌকিক প্রকাশনী, কোলকাতা।
৬ লোক ঐতিহ্যের দর্পণে – মানস মজুমদার। দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা।
৭ লোকসাহিত্য (দ্বিতীয় খন্ড) – আশরাফ সিদ্দিকী। মুক্তাধারা, ঢাকা, বাংলাদেশ।
৮ বিশ্ব লোককথার রূপরেখা – সুধীরকুমার করণ। পুনশ্চ, কোলকাতা।
৯ বাংলার লোকসংস্কৃতি – ওয়াকিল আহমেদ। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, বাংলাদেশ।
১০ কেরেঙকথমা – কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী। অক্ষর প্রকাশনী, আগরতলা।

HOME

নিবন্ধ

লাইহারাওবা, মণিপুরিদের এক প্রাচীন লৌকিক উৎসব

সদানন্দ সিংহ

বর্মার রাজা মণিপুর দখল করে রেখেছিল সাত বছর, ১৮১৯ থেকে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তখন প্রচুর মণিপুরি মণিপুর ত্যাগ করে ত্রিপুরা, বাংলাদেশ, কাছাড় এবং আসামের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন। আগে ত্রিপুরারাজের সাথে মণিপুরের সম্পর্ক ভাল ছিল না। খ্রীষ্টাব্দ ১৫৩৩, ১৬৩৪, ১৬৯৬ এবং ১৭২৪ সালে চারবার যুদ্ধ হয়েছিল মণিপুর ও ত্রিপুরার মধ্যে। তবে প্রথম সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা শুরু হয়েছিল ১৬০৯ সালে যেখানে ত্রিপুরার রাজা মণিপুরের এক রাজকন্যাকে বিয়ে

করেছিলেন। ঐ সময় থেকেই সূচনা হয়েছিল ত্রিপুরা রাজ্যে মণিপুরিদের বসবাস। [There were wars between Manipur and Tripura in 1533, 1634, 1696 and 1724. Tripura is adjacent to East Bengal. So people who migrated from Bengal to Manipur often stayed in Tripura for some time and reached Manipur. Manipur used to buy elephants from Tripura also. Elephants from Tripura often bore Sanskrit name or names derived from Sanskrit. One such elephant was Mukta (pearl). Another was Hera (diamond). Marriages between kings of Tripura and women of Manipur was not frequent. But there was one such marriage in 1609. In that year a Manipuri woman of Akoijam family married a king of Tripura.--- History of Medieval Manipur (Part-3), R.K.Jhalajit Singh]

তখন মণিপুরের রাজকন্যার সাথে বেশ কিছু মণিপুরি অনুচর রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি জায়গায় বসতিস্থাপন শুরু করেছিলেন। চারবার যুদ্ধের পর শেষপর্যন্ত সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে। যার ফলে বার্মিজ আক্রমণের পর মণিপুরিদের ত্রিপুরায় বসবাস খুব সহজেই হয়ে গিয়েছিল। মণিপুরিরা মণিপুরের বাইরে ছড়িয়ে পড়ার প্রায় দু'শ বছর অতিক্রান্ত হবার পর স্বাভাবিক ভাবেই মূল ভূখণ্ডের সাথে বিছিন্ন থাকার দরুন মণিপুরে যেসব উৎসব পালিত হয় তার সমস্ত হয়তো পালিত হয় না, কিন্তু পালন করার চেষ্টা করা হয়। তেমনই একটি উৎসব হল লাইহারাওবা উৎসব। তবে এই উৎসব পালনের জন্যে আচার-অনুষ্ঠানের পদ্ধতি জানা মাইবা-মাইবী ত্রিপুরাতে নেই বলে ইদানীং মণিপুর থেকে মাইবা-মাইবী এনে লাইহারাওবা উৎসব পালিত হচ্ছে। একটা সময় ত্রিপুরাতে এই উৎসব উদ্‌যাপন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

যখন কোন জাতি বা সম্প্রদায় কোন ধর্মীয় বা কোন ট্র্যাডিশনাল আচার-অনুষ্ঠান বা উভয় দিকটিকে একসঙ্গে উপলক্ষ করে সবাই অংশগ্রহণ করে আনন্দে মেতে উঠে, তাকেই আমরা উৎসব বলতে পারি।

আনন্দ আমাদের জীবনেরই বহিঃপ্রকাশ যা বেঁচে থাকার রসদ যোগায়। স্বপ্নহীন কোন নিরানন্দ লোক পৃথিবীতে বেশিদিন বাঁচতে পারেনা। তাই উৎসব ব্যাপারটা সেই আদিম যুগ থেকে এখনো চলে আসছে। এর কোনদিন শেষও নেই।

মণিপুরিদের অনেকগুলি উৎসবের মধ্যে লাইহারাওবা উৎসব একটি বহূ প্রাচীন উৎসব। লাইহারাওবা একটি প্রাক্‌বৈষ্ণব লৌকিক দেবদেবী ভিত্তিক প্রাচীন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, তখনকার জীবনযাত্রার মিথ, লোককাহিনি, প্রাচীন মন্ত্র-তন্ত্র-স্তোত্র, নাচ-গান ইত্যাদি সবের এক ব্যাপক রূপ যা প্রাচীন মণিপুরিদের কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। মাইবা(পূজারী)-মাইবী(পূজারিনী)-র নানারকম

আচার-অনুষ্ঠান এবং জাগোই(নাচ) আর পেনাবাদকের পেনা ও ঈশৈ(গান) লাইহারাওবার প্রধান অঙ্গ। পেনা হচ্ছে বেহালার মত একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। তাই লাইহারাওবা উৎসব মণিপুরের এক প্রাচীন উৎসব। নৃত্য নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদেরও বক্তব্য যে লাইহারাওবা উৎসবের অঙ্গ মাইবী নৃত্যে যে মুদ্রাগুলি প্রচলিত সেগুলি খ্রীষ্টপূর্ব যুগের।

লাই শব্দের অর্থ হল দেবতা, হারাওবা শব্দের অর্থ হল আনন্দে মেতে ওঠা। এই উৎসবের মাধ্যমে আমরা মণিপুরি সমাজের এক বিবর্তনের রূপ দেখি যেখানে আমরা জানতে পারি সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার মূল আহরণ অন্ন-বস্ত্র-ঘরের উপায়গুলি কীভাবে হাসিল হয়েছিল।

লাইহারাওবা নিয়ে দু রকম মতবাদ দেখা যায়। এক, মণিপুরে সর্বপ্রথম এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল কৌব্রু পাহাড়ে। সেই সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত উৎসবে নোংপোক নিংথৌ(দেব) এবং পান্থৈবী(দেবী) অনুপস্থিত ছিলেন, যার ফলে সেই উৎসব ছিল এক অসম্পূর্ণ উৎসব। দুই, আরেক মতবাদ হল এই উৎসব সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয় মণিপুরের নোংমাইজিং পাহাড়ে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বর্তমান মণিপুরি বা মৈতেই ভাষার পূর্বসূরী হচ্ছে অরিবা ভাষা। মণিপুরি ভাষায় অরিবা শব্দের অর্থ প্রাচীন। বৈষ্ণবধর্মের আগ্রাসনে মণিপুরের রাজা একসময় এইসব অরিবা ভাষায় (প্রাচীন মণিপুরি ভাষায়) লেখা পুঁথিগুলিকে পরবর্তীকালে নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং একদিনে প্রায় দু'শর উপর পুঁথি আগুনে নিক্ষিপ্ত করেছিলেন। এটা মণিপুরের লোককাহিনি এবং ইতিহাসের এক ঐতিহাসিক ক্ষতি বলে স্বীকৃত। কিছু কিছু পুঁথি তখন লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। এই অরিবা ভাষা বর্তমানে অপ্রচলিত এবং এখন এ ভাষায় কেউ কথা বলেনা। যেমন বাংলায় চর্যাপদের, ব্রজবুলি বা সাধু ভাষায় এখন কেউ কথা বলেন না। অরিবা ভাষায় লেখা একটা পুঁথি পাওয়া গিয়েছিল যার নাম পান্থৈবী খোঙ্গুল। এই পুঁথিটাকে মোইরাংথেম চন্দ্র সিংহ আধুনিক মৈতেই ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন। এই বই অনুযায়ী দ্বিতীয় মতটি প্রতিষ্ঠিত। খ্রীষ্টপূর্ব সময়ে রাজা পাখংবা আমলের আরো আগে নোংপোক নিংথৌ(দেব) এবং পান্থৈবী(দেবী) আমলে প্রথম এই উৎসবের সূচনা। পাখংবার রাজত্বকাল আনুমানিক ৩৩ খ্রীষ্টাব্দ (চৈথারেল কুম্বাবা পুঁথি)। মণিপুরের মাইথোলজি অনুযায়ী পাখংবা হচ্ছেন মানুষ ও দেবতার মিশ্রণ। আবার স্থানের উপর ভিত্তি করে লাইহারাওবা উৎসবকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যেমন কংলেই হারাওবা, মোইরাং হারাওবা, চাকপা হারাওবা, সেক্‌মাই হারাওবা, আন্দ্রে হারাওবা, কক্‌চিং হারাওবা ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে এইসব স্থানভিত্তিক উৎসবের মূল essence-টা মোটামুটি একই রকমের।

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে এখনো লৌকিক দেবদেবীরা পূজিত হয়ে থাকেন। লৌকিক দেবদেবীরা আসলে কোন জাতির ধর্মায়নের আগের নিজস্ব এবং আদি দেবতা। বাংলার যেমন শীতলা দেবী, ওলাওঠা দেবী, মনসা দেবী। মনসা দেবীকে নিয়ে তো আবার হিন্দু পুরাণের সাথে যোগসূত্র তৈরি করা হয়েছে। তবে হিন্দু মণিপুরিদের লৌকিক দেবদেবী যেভাবে প্রচুর সংখ্যায় বিরাজমান, সেভাবে

সংখ্যার দিক দিয়ে অন্য কোন জাতির দেবদেবী আছে কিনা জানা নেই। মণিপুরিদের প্রধান পুরুষ লৌকিক দেবতারা হলেন অতিয়া শিদাবা, আপ্নবা, আশিবা, পাখংবা, সনামহী, নোংপোক নিংথৌ এবং মহিলা লৌকিক দেবীরা হলেন লৈমারেল শিদাবী, পান্থৈবী। এছাড়াও আরো ৩৬৪ জন লৌকিক দেবদেবী বিরাজমান।

জল মানেই জীবন
জল থেকেই প্রাণ
মায়ের গর্ভেই সুপ্ত প্রাণ
এ জগৎ মায়ের আধার

লাইহারাওবার প্রথম দিনটি শুরু হয় লাই ইকৌবা পর্ব দিয়ে। এজন্যে জলের কিনারেই (সাধারণত পুকুর বা নদীতে) উৎসবের সূচনা হয় দেবতার বন্দনা-প্রার্থনা-আহ্বানের মধ্য দিয়ে। আমার মনে হয়, এ থেকেই ধারণা নেয়া যেতে পারে মনিপুরের সীমানা একসময় সমুদ্রের তীরবর্তী পর্যন্ত ছিল। তারপর নিয়ম-কানুন আচার-অনুষ্ঠান মেনে উৎসবের পর্ব চলতে থাকে কয়েকদিন ধরে। উৎসবের সময়সীমা সাধারণত ১ থেকে ১৫ দিন পর্যন্ত হয় এবং বেজোড় সংখ্যায়। লাইহারাওবার উৎসবের শুরুও হয় কোন বেজোড় তারিখের দিনে। বেজোড় সংখ্যা সাধারণত 'অগুন্তি' শব্দের সিম্বল। ঝাঁক, রাশি, অসংখ্য ইত্যাদি বোঝাতে কোন জোড় সংখ্যার কল্পনা করা হয় না। মনে হয় এই বেজোড় সংখ্যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের চাহিদা অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ের প্রাচুর্যের বন্দনাই করা হয়েছে। এই উৎসবে পেনাবাদকের oral literature, মাইবী জাগোইয়ের মাধ্যমে মিথের উপস্থাপনা, মুক্না লমজেল-এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাচীন খেলা, তাংখুল নুরাবী নৃত্য-ড্রামার মাধ্যমে উপজাতিদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা দিয়ে ভরপুর এই উৎসবের সমাপ্তি ঘটে "হোই" আওয়াজ, ফুঙ্গারেল জাগোই এবং থাং জাগোই (তরোয়াল নিয়ে নৃত্য)-এর মধ্য দিয়ে।

লাইহারাওবা উৎসবের appearance যদিও দেবতাদের বর প্রার্থনা, কিন্তু অন্তর্নিহিত ব্যাপারটা এক বিরাট Myths, legends, folklore, oral literature নিয়ে তৈরি যেখানে জগতের উৎপত্তি, প্রাণের উৎপত্তি, মানুষের বসতিস্থাপন, কৃষিকাজ, আশ্রয়স্থল তৈরি, পরিবার-সমাজ গঠন ইত্যাদি নিয়ে উপস্থাপিত এবং সর্বোপরি মৈতেই জাতির সুপ্রাচীন অস্তিত্বের এক জ্বাজল্যমান প্রমাণ।

HOME

মুক্তগদ্য

কবির কাছে আছে

নকুল রায়

কবির কাছে খুচরো পয়সার মতো শব্দ থাকে যা প্রয়োজনে ব্যবহার করেন। কবিতা একেকটি আস্ত নোট যা খুচরো করলে অনেকগুলো মুদ্রা পাওয়া যায় যা ব্যবহার করে তার জীবনীশক্তির পরিচয় দেন।

শব্দকে নিয়মিত চিনতে এবং জানতে কবিকে বহুপথ হাঁটতে হয়; সব পথেই বাধা-কাঁটা-অমসৃণতা থাকে এবং বিশ্বের সকল মানুষের ক্ষেত্রেই সেটা থাকে – বাধা অতিক্রম করার যে-লড়াই সাধনার সঙ্গে যুক্ত তা মানব প্রজাতিরই। সাধনা বাদ দিলে বাকি যে লড়াই তা সকল প্রাণীজগতেরই আছে; শুধু দেখতে হবে শব্দ ও বাক্যবন্ধনে কীভাবে কবিতা হয়ে ওঠে তা বিভিন্ন কবির বিভিন্নতা আছে বলেই – মানুষই একমাত্র ভাষাকে ব্যবহার করে কবিতা এবং কণ্ঠকে ব্যবহার করে গান গেয়ে উঠতে পারে – এ-বস্তু সাধনাব্যতীত সম্ভব নয়। কবিকে কবিতার মর্মমূল ভেদ করে তাকে নিজের

মতো করে লালনপালন করতে হয় বলেই পৃথিবীর সব কবিতাই স্বতন্ত্র। এমনকি বিভিন্ন দুর্বল কবিতার ক্ষেত্রেও তা খাটে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি অনেক সময় আড়ালে থেকে যায়, দেখা যায় কবির মৃত্যুর পর সেসব কবিতা কবিকে প্রতিষ্ঠিত করে তুললো; তখন মনে হয় জীবিত সময়কালীন কবিকে আমরা চিনতে ভুল করেছি; আবার দেখা গেছে যেসব জীবিত সময়ের কবিতা নিয়ে অব্যাখ্যাত ও দুর্বল কবিতাগুলি তখন শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে বিবেচনাধীন; আবার সেইসব কবিদের নিয়ে নাচানাচি হয়েছে – কালের ইতিহাসে পরবর্তী সময়ে তা আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে, ইতিহাস এভাবেও পরবর্তী প্রজন্মের কবিদের আভাস দিয়ে তাদের সাবধান করে দেয়; অর্থাৎ কবিতা যদি কাল অতিবাহিত হয়ে অন্যকালেও তা আধুনিক থেকে যায়, মননশীলতার পরীক্ষায় সেসব উত্তীর্ণ হয় যদি; তাহলে বলবো সেই সৃষ্টির কবিরা বহুদর্শী। সমকালীন সময় বিচারে এসব শ্রেষ্ঠ কবিদের মনে আশা জাগিয়ে তোলে, তাদের নিজেদের সৃষ্ট কবিতাগুলির মধ্যে দু-একটি কবিতাও যদি কালের গর্ভে বেঁচে যায়, সেই আশা তারা মনে মনে শতকরা দুইভাগ হয়তো পোষণ করেন মাত্র; কিন্তু কবিতার সৃষ্টিতে যারা বিভোর, মানসিক বিভাব নিয়ে যারা জীবনের অপূর্ব মূল্যবান সময় তারা কাটিয়ে দেন শুধু কবিতা সাধনা করেই – তাদের বাস্তব জীবনে তো সর্বক্ষণ কাঁটা ছড়ানো থাকে, সেইসব বাধা সরিয়ে মানুষের মতো মানুষ হয়ে বেঁচে উঠতে চান বলেই সেইসব মহৎ কবিরা কঠোর সংগ্রামে জ্বলন্ত চুল্লির পাশে বসবাস করেন। সার্থক অন্তত গোটা কয়েক কবিতার জন্য কালকে, সময়কে বাজি ধরে বসবাস করেন; আর অপমানিত-লাঞ্ছিত-নিগৃহীত দারিদ্র্যে ভোগা সাধারণ মানুষের মতোই বেঁচে থাকতে চান কবিরা; শ্রেষ্ঠ কবিদের জীবনযাত্রায় সাধুতার পরীক্ষা নিশিদিন দিতে হয় বলে—যারা কবিতা বোঝেন না পড়েন না একটি লাইনও সেই ভুখা দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট, অশিক্ষিত কোটি কোটি বিশ্বমানবতার পক্ষে বেঁচে থাকেন শ্রেষ্ঠ কবিরা, যাদেরকে অনেকেই আবার জীবিতকালে খুবই নগণ্য-তাৎপর্যহীন সাধারণ্যের স্তরে টেনে এনে কবিতার কুব্যাখ্যায় জর্জরিত করে তোলেন বহু রাজনীতিক, ব্যবসায়ী সমালোচক, এমনকি সমকালীন রাজনৈতিক তাবেদারে পুষ্ট বিশিষ্টজনেরাও।

কবিতা লিখতে গিয়ে নিজস্বতা, নিজস্ব প্রকরণের রহস্য সকল কবিরা সবসময় খুঁজে পান না। সমালোচক যদি পণ্ডিত হয়, যিনি কবি চিনে ফেলবেন, তা নাও হতে পারে। কবিরা পণ্ডিত হতে পারেন; বিজ্ঞানী কিংবা দার্শনিক হতে পারেন; হতে পারেন বিপ্লবের গর্ভাশয় থেকে উৎসারিত মানুষ – কিন্তু পণ্ডিত-সমালোচকরাই কবি হবেন, কে বললো। যেকোনো সমালোচনায় যদি সৃষ্টির আভাস থাকে, যদি সমালোচনা পড়ে কবি নিজেকে চিনে নিতে পারেন, তেমন সেই লেখার দাবি চিরকালের জন্য সত্য। সেই সত্য পাঠকের মতোই তৃষ্ণা নিয়ে বারবার কবিরা পড়েন, আত্মসমালোচনা করেন। তারপরেও কবিদেরই কবিতা সৃষ্টির অধিকার জন্মায়।

HOME

মুক্তগদ্য

পরিসংখ্যান

অরুণিমা চৌধুরী

বছরের ঠিক এই সময়টায় আমি একটা পরিসংখ্যান হয়ে যাই। স্রেফ এককের ঘর.. শূন্য থেকে শুরু হয়ে দুইয়ে গিয়ে আটকে গেলো যখন, হাত-পা বেঁধে ঢুকিয়ে দিলো স্ক্যানিং মেশিনে। বেঁচে থেকে দেখে নিলাম হাড়মাস খসে যাওয়া আমার আদত নরকঙ্কাল, করোটি.. সাদা দাঁত বের করা খিঁচোনো চেহারা...বাঙাল ভাষায় একটা কথা আছে, " কপাল কুষ্টি".. তাই হয়ত পরিসংখ্যানের বয়স বাড়ার সুযোগে ঢুকে পড়লো তিন আর চার। চার পূর্ণ হলে ছুটি মিললো ছয়মাসের। তারপরেই আবার বিপত্তির চোখরাঙানি.. দেহ যন্ত্র, অন্ত্র তন্ত্র.. আহা, কার এতো সৌভাগ্য হয় বলুন তো! অথচ আমি দেখলাম সব, কালো প্লাস্টিকে ছাপা আমাকে। বেঁচে থাকাটা মশাই, আমার জন্যে বিরাট অভিজ্ঞতা.. সাঁতার না জেনে ডুব দিলে কেমন হাঁকপাঁক করে জানেন তো! আমিও বছরের ঠিক এই সময়, মানুষ থেকে যখন আস্ত একটা পরিসংখ্যান হয়ে যাই, সংখ্যাগুলো হাঁকপাঁক করে,

ফুরিয়ে আসে। এককের ঘর ফুরোতে আর কত বাকি থাকে, আমি কড় গুনি, গুনতে গুনতে পথ ভুলে যাই, একটা একটা করে মুহূর্ত খসে পড়ে মুঠোভর্তি বালির দানার মতো.. ছুটি ফুরিয়ে আসে.. আমার জীবন্ত ভিসেরার টুকরোটি মুম্বাইয়ের কোন এক বিখ্যাত ল্যাবরেটরিতে আরকে চোবানো থাকে, মৃত মাংসখন্ডে বেড়ে চলে কর্কটকোষ.. কি অদ্ভুত বলুন তো! কথায় বলেনা, যার শিল, যার নোড়া, তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া! যে দেহ আশ্রয় করে কর্কট বাঁচে, সে দেহ বিনষ্ট হয়, তবু দাঁড়াগুলো কামড়েই চলে..

পাঁচ অবধি এসে আমার গল্পগুলো নথিবদ্ধ হয়, আমি মির‍্যাকুলাসলি বেঁচে থেকে কাকে কাকে কাকে যেন উদ্ধার করি..নির্বাচিত কেমো রেজিমেন সফল করে চওড়া হাসিটি এঁকে দিই গবেষণাকারীর মুখে,একেবারে ASCO অবধি একটি ব্রাউন চামড়ার নাম পৌঁছে যায়। দ্য মোস্ট অ্যাগ্রেসিভ কেস অফ ট্রিপল নেগেটিভ ব্রেস্ট ক্যান্সার.. লুক, ইটস আ রেয়ার সাকসেস টু সারভাইভ ফর লং "ফাইভ ইয়ার্স"....!!!

ছুটি ফুরিয়ে এলে বছরকার সেবাসদন আমায় যন্ত্রের পেটে ভরে আবার নাড়াচাড়া করে, উল্টেপাল্টে দেখে শিকারি বিড়ালের মতো... এবার ছয়ের ঘর.. ছয় ছক্কা... কি জানি সাপের মুখ না মই... হ্যালো দুহাজার সতেরো! আমার জন্যে কী বরাদ্দ রেখেছো ঝুলিতে!

HOME

মুক্তগদ্য

ফেবু

নির্মাল্য কুমার মুখোপাধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে মহর্ষে! আপনি কহিলেন যে, কলিযুগে ফেবু নামে মনুষ্য মাঝে এক প্রকার আলাদা প্রজাতি পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন। তাঁহারা কি প্রকার মনুষ্য হইবেন এবং পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কি কার্য্য করিবেন, তাহা শুনিতে বড় কৌতূহল জন্মিতেছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া সবিস্তারে বর্ণন করুন।

হে মহারাজ, যাহারা কর্ণে দুটি রজ্জু প্রবেশ করাইয়া একটি মোবাইলে প্রান্ত গুঁজিয়া আহার-নিদ্রা পারিলে মৈথুনকার্য সম্পন্ন করিবার সময়ও উক্ত মোবাইলের উপর ভাগ খুঁটিতে অথবা বৃদ্ধাঙ্গুলি ডলিতে থাকিবে এবং ডাকিলে সহজে শুনিতে পাইবে না তাহারা ফেবু।

হে রাজন, যাহারা পরীক্ষার সময় পড়িতে বসিয়া ঢুলিবে অথচ অন্য সময় কম্পিউটারের সম্মুখে বিস্ফারিত নয়নে জাগিয়া রাত্রি পার করিবে তাহারাই ফেবু।

মহারাজ, যাহারা আপন আপন ছবি আপনার নামের পার্শ্বে না টাঙাইয়া অন্যের ও জগতের যত উদ্ভট বস্তুর চিত্র নিজ নামের সঙ্গে লাগাইবে তাহারাই ফেবু।

যাহারা বিনা দ্বিধায় নারীগণ পুরুষ নাম ও পুরুষগণ নারীর নাম ধারণ করিয়া অন্যের সহিত উদ্ভট সম্পর্ক স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইবে তাহারাই ফেবু।

যাহারা ইংরাজি হরফে আপন মাতৃভাষা গড়গড় করিয়া লিখিবে অথচ নিজ ভাষায় লিখিতে অজস্র বানান ভুল করিবে, যাহারা অতি সংক্ষিপ্ততম শব্দে মনোভাব প্রকাশ করিতে গিয়া বাক্যের শব্দের বানানের অর্থের খিচুড়ি পাকাইবে, যাহারা কিছু শব্দকে ভিন্নার্থে প্রকাশ্যে ব্যবহার করিবে, যেমন- কাহারও মৃত্যু সংবাদ পাইলেও 'লাইক' করিবে, যাহারা কে কাকে কতবার সেই অর্থহীন 'লাইক' করিল বা করিল না, তাহার হিসাব রাখিবে এবং সেই কারণে বন্ধুত্ব [সবাই বন্ধু এখানে, শত্রু বলিয়া কিছু নাই] প্রলম্বিত করিবে তাহারাই ফেবু।

জনমেজয় কহিলেন, হে মুনিপুঙ্গব! ফেবুদিগের জয় হউক।
অগ্রে আরও বিবরণ দাও, আমি এই ফেবু বিষয়ে বিশদ জানিতে বড় ব্যাকুলতা বোধ করিতেছি।

মহর্ষে, ইহা সম্পূর্ণ এক নতুন শাস্ত্র যাহার সহিত পূর্বাপর সকল শাস্ত্রের কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, উভয়ই আছে। ফেবুগণ এই শাস্ত্র বেদ বেদান্ত কোরান বাইবেল ত্রিপিটক গীতার ন্যায় মান্য করে। এই শাস্ত্রের রচয়িতার নাম – মার্ক জাকারবারগ। তর্কে- জুকারবারগ। তিনি ফেবুদের আরাধ্য। ঋষিতুল্য। অবিলম্বে মহর্ষি খেতাব পাইবেন। দেবে ফেবুগণ।

শাস্ত্রটির বিশিষ্টতা হল, শব্দ যে ব্রহ্ম সেকথা সাহেব ভালই অনুধাবন করিয়াছেন। তার সঙ্গে তিনি চিত্রকেও ব্রহ্ম বানাইয়াছেন। একবার একটি জায়গায় ঠিক মত নিক্ষেপ করিলে বাজিমাত। সারা ব্রহ্মাণ্ডে উহা মুহূর্তে তেজস্ক্রিয় বস্তুর ন্যায় ছড়াইয়া পড়িবে। হিরোশিমা হইতে ফুকুসিমা কাহাকেও ছাড়িবে না ।

HOME

গল্প

স্থানে অস্থানে

প্রদীপ সরকার

প্রচণ্ড ঝড় মাথায় অংশু বাস থেকে নামল। এ অঞ্চলের মানুষ এটাকে বাস না বলে কৃষ্ণ সিং-এর মুড়ির টিন বলে। যানটির হতাশার জন্য, নাকি রাক্ষসের মত যাত্রী গেলার জন্য; বিষয়টি দ্ব্যর্থক। তবে দূর সীমান্ত গ্রামের জন্য কৃষ্ণ সিং আর বনমালীর ঝরঝরে বাস দুটিই সুপার ডিলাক্স। শহরমুখো মুটে-মজুরের কাছে খুব আপন। একমাত্র ভরসাও বটে। অনেকে একটু সুব্যবস্থা পাবার জন্য মালিক কাম ড্রাইভারকে খাতির করে। সুযোগ পেলেই চা, খাস্তা বিস্কুট বা কুকিজ খাইয়ে খাতির জমায়। এও খুব কঠিন কাজ। কৃষ্ণ সিং, বনমালী সবসময় দার্শনিকের মত ভাব ধরে থাকে। ‘সেবাহি পরম ধর্ম’, একদম নির্লিপ্ত। শুধু উপাস্য বাসটির চারপাশে চোখ বুলায়। কখনও আবার যন্ত্রযানটির যখন তখন জ্বালাতনে খিটখিটে হয়ে থাকে। স্টিয়ারিং ছেড়ে লাফ দিয়ে মাটিতে নামলেই মনে হয়, এইমাত্র রগচটা গিন্নির সাথে তুমুল খটাখটি করে ঘর ছেড়েছে। অংশু কোনোদিনও তাদের মন

যোগানোর চেষ্টা করে না। আজকেই বোধহয় প্রথম সিটে বসে আসতে পারল। সে আজ অসময়ে ফিরেছে।

বৃষ্টির তেজ আরও বেড়ে গেছে। চারিদিকে ঝাপসা। বাসটি অংশুদের ওঠানামার জায়গা থেকে আরও প্রায় দেড় ফার্লং আগে নামিয়ে দিয়েছে। বৃষ্টির ফোঁটায় চোখেমুখে রীতিমতো ঢিল খাওয়ার মতো ব্যথা লাগছে। বেশ কতকটা হাঁটার পর তার গ্রামের রাস্তা – ঠিক রাস্তা নয়, মোটাসোটা একটা আলপথ। সেখান থেকে আরো দুই কিলোমিটার। বৃষ্টি বর্শার মতো গায়ের চামড়ার ভেতর বিঁধে যাচ্ছে। অংশু বৃষ্টিকাতর গরুবাছুরের মতো মাথা গুঁজে দৌড়ের মতো হাঁটছে। মুষলধারে বৃষ্টির কারণে আজ ঢালাইয়ের কাজ বন্ধ, পেমেন্টও বন্ধ। বেলা থাকতেই শূন্য হাতে ফিরতে হচ্ছে। সাধারণত সঙ্গীদের সাথে শেষ বাসে বাদুরঝোলা হয়ে ফেরে সে। দিনের রুজিটাও হাতে থাকে। আজকেই বকুল বলেছিল, দোকানি সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছে – গত সপ্তাহের টাকা পরিষ্কার না করলে আর এক পয়সার জিনিসও দেবেনা। ভিজতে ভিজতে ঠাণ্ডায় অংশুর শরীরে কাঁপন ধরে গেছে। কিন্তু দোকানির কথাটা মনে পড়তেই তার কানদুটো আস্বাভাবিক গরম হয়ে ওঠে। ঘরে যে আজ এক মুঠোও চাল নেই, সেটা সকালে হাঁড়িতে বকুলের হাতা নাড়ার সতর্কতাতেই আঁচ করতে পেরেছিল। বকুল এ বেলাও ঢকঢক করে জল গিলে পেট ভরাবে ? দুঃশ্চিন্তায় তার মাথা ঘুরছে।

বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে অংশুর খসখসে ধূসর পায়ের পাতাগুলো যেন ছলম ছেড়ে নতুন হয়ে উঠেছে। এত ঝকঝকে ফ্যাকাশে পা দেখে নিজেই চমকে উঠেছে। দ্বারে দ্বারে ঘুরতে ঘুরতে তার শুধু পাগুলোই নয়, গোটা শরীর, জীবন – সবটাই বিবর্ণ। পাগুলোর দিকে তাকিয়ে হাঁটতে অংশুর বেশ ভালো লাগছে। হারানো ধন ফিরে পাওয়া। চোখের ভিজে পাতায় অতীত-স্মৃতি আর স্বপ্নের ছবি ভেসে উঠছে। শৈশব থেকে চাকরির বয়স উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অম্ল-মধুর এক পর্ব।

সোঁ-সোঁ করে টিলার লাল জল ঢালু জমির দিকে নামছে। জমা জলে জমি-রাস্তা প্রায় একাকার। বিষাদময় মগ্নতায় অংশুও ডুবে গেছে। চলার গতি অনেকটা মন্থর। মাথা গুঁজে হাঁটার ভঙ্গিতে মনে হয় একালের কোনও ব্যর্থ পর্যটক কালো কুচকুচে পিচের রাস্তায় পায়ের ছাপ এঁকে এঁকে সামনে এগোচ্ছে। অংশু হঠাৎ চমকে দুপা পিছিয়ে গেল। অন্যমনস্কতায় কিছু বুঝে উঠতে পারেনি। এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে বিরাট আকৃতির দাঁড়াশ, ময়াল-সাপের সাক্ষাৎ মেলে। ঘোর কাটতেই দেখে প্রকাণ্ড এক শোল মাছ শরীর-লেজ বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে সরীসৃপের মতো পিচের রাস্তা পার হচ্ছে। এ এক অসম্ভব ব্যাপার। এই অস্থানে এটা এলো কী করে ? আশেপাশে মাছ বসবাস করার মতো কোন জলাই তো নেই। সকালে যাওয়ার সময়ও দেখেছে খটখটে মাঠে ছাগলেরা খুঁটে খুঁটে ঘাস খাচ্ছে। চারদিকে তো শুধু টিলার গড়ানো জল। অংশু হাতের ছেঁড়া চপ্পলগুলো ছুঁড়ে ফেলে অতি কষ্টে কসরৎ করে শোলের ঘাড় দুহাতে চেপে ধরল। পরক্ষণে তার মনে পড়ল; ব্যাটাকে বধ করে নয়, জ্যান্ত নিয়ে যেতে পারলে বকুলকে তাক লাগিয়ে দেয়া যাবে। লেজের কয়েকটা জুতসই আঘাতে

অংশুর কব্জি প্রায় অবশ হয়ে যাওয়ার মতো। শক্ত বন্য লতার নাকা পরানো বিশাল শোল মাছ অংশুর হাতে ঝোলানো। অংশুর চলার গতি আবার অনেক বেড়ে গেছে। মাঝেমাঝেই জোর ঝাঁকুনি দিয়ে ল্যাজায় এমন চাত্তি মারছে; অংশু বেসামাল হয়ে যায়।

ক্রমাগত ভিজে অংশুর ঠাণ্ডায় জমাট চোয়ালে, বদ্ধ মুখের অভ্যন্তরেও একটা স্বাদু তরল রস ভরে উঠছে। আদা, পেঁয়াজ, জিরাবাটা দিয়ে তেল-কৈয়ের মতো মায়ের হাতের শোল মাছের কুটি ভাজা – আঃ অমৃত! বকুল কি সেরকম রান্না করতে পারবে ? তা পরখ করার কোনও সুযোগই তো হয় নি। বিয়ের পর থেকে শাক-লতাপাতা ছাড়া কোনোদিন রান্নার কি তেমন কোনও ভাল জোগাড়পত্র দিতে পেরেছে ?

তিনমাসের মাথায় প্রথম সন্তানটা যখন নষ্ট হয়ে গেল, অনেক ধারদেনা করে ডাক্তার দেখিয়েছিল। ডাক্তারের দেওয়া খাবার-দাবারের ফর্দ অংশুর কাছে রাজসূয় যজ্ঞের মতো।

‘যে পরিমান রক্তস্বল্পতা। মাছ-মাংস-ডিমের দিকে একটু ঝুঁকুন। নইলে সন্তান টেকানো দায় হবে’।

মাছটা মাঝে মাঝে এমন ঝাঁকুনি দিচ্ছে, মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে অংশুর দান হাতটা কাঁধ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে পালাবে। অংশুর মনে ডাক্তারের ফর্দপূরণের অসামর্থ্যের দুঃখ দূর করতে বকুল প্রায়শ তাচ্ছিল্যের সুরে বলত, ‘রাখ তোমার ডাক্তারের ফর্দের কথা। একজন বলবেন মাস-মাংস-ডিম-দুধের দিকে ঝুঁকুন, আরেকজন বলবে সজনে পাতার রস খান – দুধের সমান। কলমিশাক, কলার মোচা, থোর খান – ফুল আব আয়রন। আগে আমিষ-নিরামিষের বিতর্ক শেষ হোক, পরে ডাক্তারের ফর্দ নিয়ে ভাবা যাবে’।

ক্রমাগত শরীর ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে আর হাঁ করে থাকতে থাকতে মাছটি যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ল। অংশু ভাবছে, না, ব্যাটার দম ফুরোলে চলবে না। একদম জলজ্যান্ত প্রবল পরাক্রম মাছ বকুলের হাতে তুলে দিতে হবে। লেজের চাট্টি খেয়ে বকুল কী করে সামলায়, তা দেখতে মজার ব্যাপার হবে। একটা উঁচু জায়গার সামান্য গর্তে পরিষ্কার টলটলে জল জমে আছে। এখান থেকে ছুটে পালানো সম্ভব হবে না। অংশু একটু দম নেওয়ার জন্যে মাছটিকে সেই গর্তে ছাড়ল। দীর্ঘক্ষণ হাঁ করে থাকা মুখের কপাটটি বন্ধ করতেই বেচারার মুখ থেকে কয়েকবার বুদবুদ বেরিয়ে পড়ল। তারপর একদম নিস্তেজ সটান শান্তভাবে পড়ে থাকে। অসহায় অবস্থাটা দেখে মাছটির উপর অংশুর ভীষণ মায়া পড়ে গেছে। একমনে তাকিয়ে থাকে তাই।

‘এতো জল, জলা, নদী-ছড়া থাকতে এই ডাঙার রাস্তায় অস্থানে কেন মরতে এলি ? তোদের তো আর কাজ খুঁজতে মানুষের মতো যেখানে সেখানে যেতে হয় না যে জায়গায়-অজায়গায় পড়ে মরবি? ’

মাছটি আবারও বারকয়েক চোয়াল নেড়ে মুখে বুদবুদ ছাড়ল। বৃষ্টির জোর অনেকটা কমে এসেছে। রঙিন কাঁচের মার্বেলের মতো লাল চকচকে মাছের চোখ দুটোর দিকে তাকাতেই অংশুর গা-টা ছমছম করে উঠল। আগুনের মতো লাল পাতিহীন চোখ দুটো যেন তাকে শাসাচ্ছে, 'চাঁদু! তোমাকে একবার যদি গভীর জলে নাগাল পেতাম! অন্তত বুকের দু-তিনটি পাঁজর ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতাম।এখন আমাকে নিয়ে খেলা করছ ? '

এমনই লাল গোল গোল দুটো আগুনে চোখ একদিন অংশুকে ভয় দেখাতে জ্বলে উঠেছিল। পাড়ার তথাকথিত যুবনেতা রক্তচক্ষু করে শাসিয়েছিল, বকুলের সঙ্গে ফের দেখতে পেলে ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে নদীতে ফেলে দেবে। চোখ দুটো শোল মাছের মতোই এমন বিশ্রী ছিল। অংশু একটু অন্যমনস্ক। সেদিনের জেদের কথাটা সে ভাবছে। বকুল কত দুঃসাহস দেখিয়েছিল।

'গুণ্ডাটা কী বলেছে ? আমার সাথে সম্পর্ক ছাড়তে হবে ? চল, এক্ষুণি তার বাড়ির সামনে দিয়ে শহরে যাব।'

শোল মাছটা লেজ দিয়ে জোর চাত্তি মেরেছে। গেরিলার মতো অতর্কিত হানা। জলের জোর ঝাপটায় অংশুর দুচোখ বন্ধ হয়ে গেছে। চোখ থেকে হাত সরাতেই দেখে বেচারা আবার শান্ত। মুখ দিয়ে একটু একটু করে খাবি খাচ্ছে। তবে অংশুর দিকে ভয়ঙ্করভাবে তাকিয়ে আছে। অংশু মনে মনে ভাবছে, শোল গজার জাতীয় মাছগুলো কুলীন সম্প্রদায়ভুক্ত নয় বলেই বোধহয় জান বড় শক্ত। সহজে কাবু হতে চায় না। কইমাছের জান তো আরো শক্ত। কেটে কড়াইয়ের গরম তেলে ছাড়লেও জেদে লাফাতে থাকে। হার মানতে নারাজ।

অংশু এমন হার না মানা জেদ দেখেছে বকুলের বান্ধবী তাপসীর মাসির। কিছু কাঠের যেমন উল্টো আঁশ থাকে, র‍্যাঁদায় পালিশ করা কঠিন, সেইরকম। যুবনেতা মন্ত্রী হবেন বলে রব ওঠায়, ওনাকে এখন আর কুড়িয়ে খেতে হয় না। হাতের দৈর্ঘও বেশ বেড়ে গেছে। সেই লম্বা হাতে বকুলকে ধরতে না পেরে, যখন অংশু-বকুলের প্রাণনাশের হুমকি চলছে, তখন এই মাসি রক্তচক্ষুর সামনে রুখে না দাঁড়ালে বকুলকে পাওয়া কি সম্ভব হত ?

আজকে কেন জানি অংশুর শুধু শরীরটাই নয়, বকুলের জন্য তার মনটাও ভীষণভাবে ভিজে উঠেছে। অনাহার, অর্ধাহার, অপুষ্টির কারণে প্রথম সন্তানটিকে যখন পৃথিবীর আলো দেখাতে পারল না, স্বপ্নের সব কুঁড়ি যখন ঝড়তে শুরু করেছে, তারপরেও সে মুখের হাসিটাকে কী করে বাঁচিয়ে রাখে! অংশুর উপর তার কোনও অনুযোগ নেই, অভিমান নেই। বরং উল্টো কথা বলে, 'অংশু, তোমার জীবনে আমি যদি না আসতাম, তাহলে তো তোমার মতো মেধাবীর জীবনটা এমন ছারখার হত না!'

অবশ্য অনুযোগ করবে কেন ? বকুল তো দেখছে, অংশু কী না করছে! তার কৃতিত্বের একগাদা ছাড়পত্র নিয়ে সে কোথায় না গেছে! বকুলের প্রচেষ্টাও কি কম ? তার চেয়ে কম যোগ্যতার অনেকেরই কিছু একটা সংস্থান হয়েছে। তাদের টাকাভর্তি মুঠি আর পেছনের খুঁটি – দুটোর একটাও

নেই। কত পাত্রে-অপাত্রে ঘুরেছে, কোথাও নির্দয় সম্ভাষণ, কোথাও প্রত্যাশার হাতছানি – এক একসময় মনে হয়েছে, আশার ঘন মেঘে আকাশ ভারি হয়ে উঠেছে, মাথার খুব কাছে নেমে গেছে, তাদের বিশুষ্ক জীবনে বর্ষণ হতে আর বেশি বাকি নেই।

অংশু শেষ ইন্টারভিউর জন্য যেদিন পেছনের সারিতে দাঁড়ানো, সেইদিনই বুঝতে পেরেছে প্রতারণার মেঘ উধাও। তার হাতে ময়লা ছেঁড়াফাড়া ছাড়পত্রগুলো দেখে অনুজ এক কর্মপ্রার্থী দুঃখ করে বলেছিল, 'অংশুদা, সার্টিফিকেটগুলোর কী দশা করেছেন ? লেমিনেশান করাতে পারলেন না ?'

অংশুর মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি। খেলা শিক্ষা, সাংস্কৃতিক জগতের একগাদা ছাড়পত্র মেলে ধরে বলেছিল, ভাই, এইগুলোর আয়ু মাত্র তিনমাস। তারপর আমার ডবল ডিগ্রি হয়ে যাবে। বেকার প্লাস ওভার এজ্‌ড্‌!'

সেদিন অন্যদের সাথে অংশুও বাতাস কাঁপিয়ে হেসেছিল, তবে সেটা ছিল একধরণের কান্না।

অংশু মাছ আর চপ্পলের মধ্যে হাতটা একটু বদল করে নিল। ডানহাতের কব্জিটা বেশ ধরা ধরা ঠেকছে। মাছটা অনেকক্ষণ পর আরেকটা ঝাঁকুনি দিয়ে বুঝিয়ে দিল সে দমবার পাত্র নয়। এই নাড়ানাড়ি তার পছন্দ হচ্ছে না। অংশু এখন তার ডানহাতের কব্জির জন্য বেশিক্ষণ ভারী কিছু বইতে পারেনা। একদিন উপরে ইট ছুঁড়ে দেবার সময় মিস্ত্রির হাত থেকে ফসকে পড়ে কব্জিটা দারুণ জখম হয়েছিল। সমবেদনার পরিবর্তে ঠিকাদারের গালমন্দ শুনতে হয়েছে, 'আগেই বলেছিলাম, এইসব অর্ধশিক্ষিত দিয়ে কোনও কাজ হবে না। না হালের না বীজের। তখন কত তোষামোদ – আমাকে একটু সুযোগ দিয়ে দেখুন, আমি সব পারি। দেখলাম তো পারার ছিরি।'

সেইদিনই অংশু প্রথম তার বিদ্যা, বুদ্ধি, মর্যাদা সব থান ইটের নিচে চাপা দিয়েছিল। বকুলের কষ্টটা তাকে বোবা করে দিয়েছে। কোনও প্রতিবাদ করেনি। তার বর্তমান বাস্তব অবস্থার সাথে দুটো জগতকে কোনোভাবেই মেলাতে পারছিল না। কলেজে অধ্যাপক পিঠ চাপড়ে বলেছেন,'অংশু, এইভাবে চালিয়ে যেতে পারলে তোমার দ্বারা অনেক কিছুই সম্ভব।' আর ঠিকাদার ? নিষ্কর্মা অপদার্থ অংশু সত্যের কোনও সংগতি খুঁজে পায় নি।

কব্জির ব্যথাটা আড়াল করতে অংশু বকুলকে অনেক মিথ্যে কথা বলেছিল। আজকাল তাকে অনেক জায়গায় মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়। পরিচিত এলাকা ছেড়ে অনেক দূরে কাজ খুঁজতে যায়। বাড়ির ঠিকানা, নাম সঠিক বলে না। মজুরের কাজ খুঁজতে গেলে বলে স্কুলের গণ্ডি পেরোতে পারেনি। বকুলকে বলেছে, শহরে খাতা লেখার কাজ করে। প্রথম প্রথম বিছানায় এলানো অবসন্ন শরীরটা দেখে বকুল ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করত, 'খাতা লেখা তো বসে বসে কাজ। তুমি এত ক্লান্ত হয়ে পড় কেন!' এই সন্দেহকে নিয়ে বকুল বেশিদূর এগোতে সাহস পায় না। অংশু কি জানে যে বকুল শহরে টিউশানি করতে যায় না, দুটো বাসায় ঝিয়ের কাজ করে সে। অথচ অংশুকে বলেছে তার

বান্ধবী দুটো টিউশান জোগাড় করে দিয়েছে। অভাব আর স্বভাবের নিকট-সম্পর্ক নিয়ে অংশুর কোন মাথাব্যথাও নেই, লজ্জাও নেই। এই মুহূর্তে সমস্ত মন জুড়ে শুধু আজকে বকুলের উচ্ছ্বাসটা দেখার অপেক্ষা।

যাই হোক, কোন বিপত্তি ছাড়াই মাছটা নিয়ে অংশু বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেল। ঠিক করেছে আগে থেকে বকুলকে কিছু বলবে না। হঠাৎ চমকে দেবে। ঘরে তখনো তালা। বকুলও বেরিয়ে যায়। এক তালার দুই চাবি। সাধারণত বকুলই আগে ফেরে। এইবার অংশু কিছুটা দমে গেল। বকুল ঘরে না থাকায় তার প্রথম ক্লাইমেক্সটাই নষ্ট হয়ে গেল। বৃষ্টির জন্যে বোধহয় বকুলের আসতে এত দেরী। গত বর্ষার আগে থেকেই বলে আসছিল, একটা ছাতা কিনে দেবে। হয়ে ওঠে নি। মেয়েদের ছাতা তো শুধু রোদ-বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচানো নয়, সময়-অসময়ে অনেক কিছু থেকে আড়াল করে। ঢালাইয়ের কাজটা না হওয়ায় আজকের রুজিটাও মার খেল। আবার একটা ঘাটতিতে পড়ে গেল। অনিশ্চিত কাজে প্রায়ই তাকে এমন ঘাটতিতে পড়তে হয়। তবে যাই হোক, আগামী সপ্তাহের টাকাটা পেলেই চোখমুখ বন্ধ করে বকুলকে একটা ছাতা কিনে দেবে। ছাতাটা থাকলে তো বকুল এতক্ষণে চলে আসত। এত রাত হত না। পুরুষরা তো ভিজে ভিজেও আসতে পারে। মেয়েরা ভিজলে তো আবার অনেকের চোখে বিশেষ দ্রষ্টব্য হয়ে ওঠে। বকুলের লজ্জাটাও এমনিতেই সাধারণ মেয়েদের চাইতে একটু বেশি। পালিয়ে এসে বিয়ে করার পর অংশু একদিন বলেছিল, ‘এত লাজুক মেয়ে দুঃসাহসী প্রেমিকা হয় কী করে?’

‘যে শৈশবে তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল, তখন কি লজ্জা জন্মাবার বয়স হয়েছিল?’

‘যখন বয়সটা পেলে?’

‘কিছু না, পুরানো সম্পর্কের শুধু রূপান্তর ঘটল।’

মাছটাকে নিয়ে অংশু খুব মুশকিলে পড়েছে। এতবড় মাছ ঘরে জিইয়ে রাখার মতো কোন পাত্রই নেই। শেষমেশ একটা ভাঙা বড় কড়াইয়ে সামান্য জল দিয়ে মাছটাকে বৃত্তাকারে রেখে কাঠ দিয়ে ঢেকে রাখে। বেচারা শোল এখন আর নড়াচড়া করছেনা। অংশু তার নিস্তেজ অবস্থা দেখে চিন্তিত। বকুলকে বোধহয় আর জ্যান্ত দেখানো সম্ভব হবেনা। আবার ভাবে, নাকি ভড়ং ধরে বসে আছে। আর শেষ লড়াই লড়ার জন্য দম নিচ্ছে।

রাতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অংশুর দুশ্চিন্তা বাড়ছে। না, ঘরে বসে আর অপেক্ষা করা যায় না। বৃষ্টি অনেকক্ষণ থেমে গেছে। বকুল কোনোদিন এত রাত করে না। দুশ্চিন্তা অংশুর উদ্বেগকে বাড়িয়ে তুলছে। অনেক সরল অথচ নিহত বিশ্বাসের নিষ্ঠুর ঘটনা একসাথে অংশুর মাথায় ভিড় জমাচ্ছে। লেকের জলে সবিতার নিষ্প্রাণ শরীরটা আবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। অংশু অজানা আশঙ্কায় বকুলকে খুঁজতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো বেরিয়ে পড়ে। কোথায় খুঁজবে? সে তো কোনও ঠিকানা

জানে না। একজন মানুষকে তো আর বাড়ি বাড়ি খোঁজা যায় না। নিশ্চেষ্ট হয়ে বসেও থাকা যায় না।

অংশুর ছোট্ট উঠোনে জমাট বাঁধা অন্ধকার। বোবা নিস্তেজ রাত চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে। প্রকাণ্ড শোল মাছটির সারা শরীর বালি-কাদায় মাখামাখি। চেনা যায় না। তবু ঘাড়-লেজ বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে জলের খোঁজে বাঁচার আশায় প্রাণপণ চেষ্টা করছে। অচলপ্রায় শরীরটা টেনে টেনে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সে কি তবে জলের কোনও ঠিকানা পেয়ে গেছে? ডাঙার এ কঠিন জীবন থেকে মুক্তি পেতে তার প্রাণান্ত প্রয়াস।

শোলটা তখনো মাথা লেজ বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে অংশুর উঠোনের সীমানা অতিক্রম করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

HOME

গল্প

বৃষ্টির আগে

ত নি মা হা জ রা

যতক্ষণ দেখা যায় তাকিয়েছিল ঋতজা। এবার ফিরতে হবে। ইচ্ছে করলে গ্লাস ডোরের বাইরে থেকে উঁকিঝুঁকি মারতে পারতো। কিন্তু তাহলে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারতো না সে। ভীষণ কান্না পাচ্ছিল যে। অভীক আজ ফিরে যাচ্ছে। এই কটা দিন কি যে ঘোরের মধ্যে কেটে গেল। সামনের ট্যাক্সিটায় উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি।

কতদিন বাদে দেখা তাদের। সেই ত্রিশ বছর আগে কলেজ জীবনের পর এতদিন বাদে। অভীক কলকাতায় আসছে কাজে। তাই দেখা করার কথা বলেছিল। শ্যামবাজার মেট্রোর গেটের সামনে।

একটু দেরীই হয়ে গেছিল ঋতজার। হন্তদন্ত হয়ে মেট্রো থেকে নেমে হেঁটে এসে ফুটপাতের এককোণে অপেক্ষারত অভীককে এতদিন বাদে দেখে বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠেছিল তার। আবেগে এগিয়ে এসে হাতটা ধরেছিল। এই সেই হাত যা সে ধরে চলতে চেয়েছিল সারাজীবন।

রোদ্দুরে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে লাল লাগছে মুখখানা। আরো মায়া লাগছিল তার জন্য।
হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে ঋতজা বললো, চল তো একটু ছায়ায় কোথাও দাঁড়াই। ভীষণ ঘেমে গেছিস।
নিজেকে একেবারে ঋতজার হাতে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছে আজ অভীক। বলল, চল কোথায় নিয়ে যাবি।
-- ক্ষিদে পেয়েছে তোর ? বলেছিলি মিষ্টিদই আর পান্তুয়া খাবি। আয় দেখি কোথায় ভালো পাই।
-- কি যে ভালো লাগছে তোর হাত ধরে যেতে। আগে মাটির ভাঁড়ে চা খাব তারপরে মিষ্টি।
লজ্জা পেয়ে হাতটা ছেড়ে দেয় ঋতজা। সত্যি খেয়ালই ছিল না এতক্ষণ হাতটা ধরে আছে সে।

চা খেয়ে সিগারেট ধরালো অভীক।

-- তারপর কুট্টুস কি খবর বল?
-- কি আর দেখতেই তো পাচ্ছিস।
-- কি সুন্দর আছিস রে এখনো। তোর ফুলকো লুচির মতো গাল টা একবার টিপতে ইচ্ছে করছে গুরু।
-- চুপ কর বেশি ফাজলামি করিস না।
-- কেনো বস, আমি কি তোর কেউ নই?

ভারি অবুঝ প্রশ্ন। ঋতজা তাকায় অভীকের দিকে। আইনের হিসেবি চোখ কি হৃদয়ের সম্পর্ককে কোনোদিন পাত্তা দিয়েছে নাকি? তবু সহনশীল হৃদয় মুচকি হেসেছে বার বার। কারণ সে জানে তার জিৎ ভারি অমোঘ আর অনন্ত। সেখানে আইনের দেমাক চলে না।
কে বুঝবে এই দুই আপাত প্রৌঢ় দুই নারীপুরুষের মাঝে লুকিয়ে থাকা কিশোরকিশোরীকে? কি ভীষণ আবেগে যে তার জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে আজ অভীককে। এর মধ্যে যে কোথাও কোনো যৌনতা নেই, কলঙ্ক নেই, শুধু আছে আবেগের বহি:প্রকাশ। সেটা কেন বুঝবে না এই সমাজ।
দেখা হলে মা যদি জড়িয়ে ধরতে পারে তার সন্তানকে, ভাইবোনকে, আজ অভীক তার কোনো মহিলাবন্ধু হলে তো কোনো কুণ্ঠা বা বিধিনিষেধ থাকতো না। তবে কেন? সবসময় নারীপুরুষের সম্পর্কটাকে এমন টিপিক্যাল ষ্ট্যাম্প মেরে দেওয়া হয় কেন?

মিষ্টি খাওয়া হয়ে গেলে ব্যাগ থেকে জলের বোতল বার করে দেয় ঋতজা। খেতে গিয়ে ঠোঁটের কোণে এক টুকরো মিষ্টি লেগে আছে অভীকের। রুমাল দিয়ে আচমকা মুছে দেয় সে।
চোখটা কি গভীর হয়ে আসে অভীকের?

-- চল টানারিক্সা চড়বি? বাগবাজার ঘাটে যাবি?

.ট্যাক্সি পার্ক সার্কাস ফ্লাইওভার ক্রশ করলো। মোবাইলটা বেজে উঠলো।

-- চেক ইন করে গেছি রে মোটু। ভালো থাকিস। আবার আসবো। এবার এসে দুজনে আরো বেশিক্ষণ কাটাবো। দূরে কোথাও বেড়াতে যাব। আউট্রাম ঘাটে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ব আর ভিক্টোরিয়ার সামনে ফুচকা খাব।

এবার আর চোখের জল বাঁধ মানলো না। কতদিন ধরে তো থামিয়ে রেখেছে। আজ না হয় একটু বয়েই যাক না, ক্ষতি কি?

HOME

গল্প

জেলিফিশ

সদানন্দ সিংহ

সামনে সফেন সমুদ্র। বালির ওপর সৌ খেলা করছিল। বৃতা ছোট ছোট ঝিনুক কুড়োচ্ছিল। বালি এখনো তপ্ত হয়ে ওঠেনি। গর্জনরত সমুদ্রের ঢেউগুলি ছোট হতে হতে তীরে আছড়ে পড়ছে। পমা আর আমি কাছাকাছি বসে সৌ আর বৃতার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছিলাম। ঢেউয়ের জল আমাদের স্পর্শ করতে পারছিল না। অথচ গতকাল বিকেলে সমুদ্রের জল আমাদের এই জায়গা ছাড়িয়ে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল।

বৃতাকে আরো এগিয়ে যেতে দেখে পমা চেঁচিয়ে বলল, বৃতা, আর দূরে যাস না।

বাবা কিন্তু বলেছিলেন, কি হবে আর সুমুদ্র দেখে ! আমি উত্তর দিয়েছিলাম, অনেক কিছু। এই অনেক কিছু যে কি সেটা বাবা আমাকে আর জিজ্ঞেস করেন নি বা আমিও বলি নি। আমি জানি বাবা কোনদিন সমুদ্র দেখেন নি এবং হয়ত বৃদ্ধ বয়সে সমুদ্র দেখার আর সাধও নেই।

আমিও একজন ছাপোষা মানুষ। কিন্তু স্বপ্ন দেখি অনেক। স্বপ্নের সমুদ্র আমাকে অনেকবার ভাসিয়েছে। সমুদ্র যেন আমাকে নেশার মত টানতো। সমুদ্রের ঢেউ, ঢেউয়ের গর্জন, বালুকারাশি, বালুকারশির ওপর ঢেউয়ের আসা যাওয়া ইত্যাদি সব আমাকে আকর্ষণ করে যেত।
হয়তো অদেখা সব কিছুর ওপর আকর্ষণটা সবারই। বিশেষ করে সমুদ্রের। সমুদ্রের কথা বলতেই পমা এক পায়ে খাড়া। তারপর একদিন পরিকল্পনা মত এক বছরের ছেলে সৌ আর পাঁচ বছরের মেয়ে বৃতাকে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম।

সৌ বসে খেলছিল। এবার সে উঠে দাঁড়াল। আর বালির ওপর দৌড়োতে দৌড়োতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়ে ওর দিদির দিকে দৌড়ে গেল।
পমা আবার চেঁচাল, বৃতা, ভাইকে ধরে রাখিস। ছাড়িস না।
সমুদ্রের তীরে অনেক মানুষ একা বা সঙ্গীসহ বসে রয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই সাদা চামড়ার বিদেশী মানুষ। পুরীর চক্রতীর্থ রোডের এই সমুদ্র সৈকতে হৈ-হল্লোড় নেই স্বর্গোদ্বার সমুদ্র সৈকতের মত। এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে নির্জনতাসহ বসা যায়।
এসেছিলাম ভুবনেশ্বর হয়ে। ওখানে একদিন থেকে উদয়গিরি,খণ্ডগিরি,নন্দনকানন ইত্যাদি জায়গাগুলি দেখে নিয়ে পুরীতে এসে চক্রতীর্থ রোডের এক হোটেলে দশদিনের জন্য একটা ঘর নিয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল প্রাণভরে সমুদ্র দেখবো, সমুদ্রস্নান করবো, বালির ওপর অনেকদূর হেঁটে যাবো। এর মধ্যে একদিন গেলাম কোণারক, আরেকদিন পুরী দর্শন। তারপর শুধু সমুদ্র আর সমুদ্র। প্রথম প্রথম খুব ভালো লাগত। বালির ওপর ঢেউয়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বারবার দৌড়ে গেছি আমরা। প্রতিদিন সমুদ্রস্নান করেছি এক উচ্ছ্বাস নিয়ে। সমুদ্রের তীরে তীরে বালির ওপর দিয়ে হেঁটে গেছি অনেক দূরে। কিন্তু চার-পাঁচদিন পর মনে হল হাঁটতে হাঁটতে আমরা যেন একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আরো এক-দুদিন যাবার পর বুঝতে পারলাম আমরা সত্যিই এখন ক্লান্ত। সমুদ্র যেন ধীরে ধীরে আমাদের গ্রাস করছিল। ক্রমে ক্রমে একসময় আমার মনে হল ঢেউয়ের গর্জন যেন ঝড়ের হুঙ্কার। বুঝতে পারলাম কাছে থাকতে থাকতে একসময় সবকিছুর গুরুত্ব একদিন কমে যায়। বিশাল কোন জিনিষকেও ক্ষুদ্র বলে মনে হয়।
হাতে কোন কাজ নেই তাই প্রাতরাশ সেরে হোটেল থেকে বের হয়ে সমুদ্রের দিকে আবার চলেছি। সমুদ্রের তীরে বসাই এখন আমাদের কাজ। হোটেলের আমাদের পাশের রুমের জার্মান ভদ্রমহিলা গুড মর্ণিং বলে এগিয়ে চলে গেলেন।
বালির ওপর বসে পড়লাম। ছেলে-মেয়ের সঙ্গে পমাও ঝিনুক কুড়োতে লেগে গেছে। বাইনোকুলার বের করে আমি চারিদিক দেখতে লাগলাম। এক জায়গায় দেখতে পেলাম বিকিনি পরে এক বিদেশিনী শুয়ে আছে। বিদেশিনীর শরীরের খোলা অংশগুলি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। বাইনোকুলার

থেকে চোখ সরাতেই দেখি পমা আমাকে লক্ষ করছে। আমি আবার অন্যদিকে দেখতে লাগলাম। এইসময় আমি দেখলাম একটা বিদেশী লোক সমুদ্রে নামছে। আস্তে আস্তে লোকটা হাঁটুজল, তারপর কোমরজল, শেষে বুকজলে নেমে একটা ঝাঁপ দিয়ে সমুদ্রের দিকে সাঁতরে এগোতে থাকে। কিছুক্ষণ পর দেখলাম ডুব মেরে ঢেউ কাটিয়ে লোকটা সমুদ্রের অনেক মাঝে চলে গেছে। একসময় সমুদ্রের মাঝে আমি তাকে হারিয়ে ফেললাম। বাইনোকুলার দিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাকে দেখতে পেলামনা। তবে আমি নিশ্চিত ছিলাম লোকটি কিছুক্ষণ বাদেই তীরে ফিরে আসবে। আগেও আমি দেখেছি কয়েকজন বিদেশী লোককে সাঁতার কেটে এগিয়ে গেছে এবং পরে আবার ফিরে এসেছে। লোকগুলির কাছে এটা একটা খেলার মতন।

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম লোকটি কখন ফিরে আসবে। এবার কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে গেল, লোকটি ফিরেই আসছে না। মাঠায় চিন্তা এল, ডুবে যায় নি তো ? এইসময় আমি দেখলাম লোকটা ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে ফিরে আসছে। তীরে এসেই ও বালির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল।

আগামীকাল চলে যাবো। যাবার আগে বিদেশী লোকগুলির মত একবার ওভাবে সাঁতার কাটার নেশায় আমাকে ভীষণভাবে পেয়ে বসল। বাইনোকুলারে দেখে দেখে আমি ওদের টেকনিকটা শিখে ফেলেছি। তাছাড়া আমি ভালোই সাঁতার জানি। ডুব দিয়ে দিয়ে ঢেউ কাটিয়ে সমুদ্রের মাঝে চলে যাবো, তারপর ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে আবার তীরে ফিরে আসবো। কোন অসুবিধেই হওয়ার কথা নয়।

স্নানের জন্যে প্রস্তুত হয়েই বেরিয়েছিলাম। জামাকাপড় খুলে ফেললাম। গায়ে আমার শুধুমাত্র একটা সর্ট প্যান্ট। আমার দিকে চেয়ে পমা বলল, বেশি দূরে যেও না কিন্তু।

আমাকে সমুদ্রের দিকে এগোতে দেখে বৃতা ভাইকে নিয়ে দৌড়ে এসে বলল, বাবা আমিও যাবো। বললাম, তোরা এখন মায়ের কাছে বস। আমি কিছুক্ষণ পরে নিয়ে যাবো তোদের।

আমি ধীরে ধীরে সমুদ্রের জলে নামতে লাগলাম। ছোট ছোট ঢেউগুলি লাফ মেরে পার হলাম। একটা বড় ঢেউ এলে আমি ডুব দিয়ে কাটিয়ে গেলাম। আবার আরেকটা ঢেউ এলে আগের মত ডুব দিয়ে কাটিয়ে গেলাম। এইভাবে ঢেউ কাটিয়ে কাটিয়ে আমি সমুদ্রের দিকে যেতে থাকলাম। একটা খেলার নেশায় যেন আমাকে পেয়ে বসল। মনে হল, কত সহজ এই খেলা। আমি সমুদ্রের দিকে যেতেই থাকলাম।

হঠাৎ আমার খেয়াল হল, আমার চারিদিক ঘিরে শুধু ঢেউ আর ঢেউ। রাশি রাশি ঢেউ। সমুদ্রের পার আর আমার নজরে এলো না। পারটা যে কোনদিকে আমি বুঝতেই পারলাম না। চারিদিকে সমুদ্রের ভয়ংকর গর্জন। এরি মাঝে একটা ক্ষীণ কণ্ঠ কানে আসে, বা-বা। আওয়াজটা যে কোনদিক থেকে আসছে বুঝতেই পারলাম না। আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম। সমুদ্রের বিশালতার মাঝে এক

খড়কুটোর মত খাবি খেতে লাগলাম। যেন এক মৃত্যু গহ্বরে আটকে গেছি। সাহায্য করার কেউ নেই। ঢেউয়ের মাঝে আমি ভাসছি আর ডুব দিচ্ছি। আবার ভাসছি। আবার ক্ষীণ কণ্ঠ কানে এলো, বা-বা। বুঝতে পারলাম, বৃতা আমাকে ডাকছে। ফুটো হয়ে যাওয়া বেলুনের মত আমার দম আস্তে আস্তে ফুরিয়ে আসছিল।

এইসময় একটা জেলিফিশ যেন আমার দিকে তেড়ে এলো। আমি তাই হঠাৎ ঢেউয়ের মাথায় একটা লাফ দিলাম। ঢেউ আমাকে আছড়ে ফেলল। কিছু নোনা জল আমার পেটে চলে গেল। আরেকটা ঢেউ এল। আবার আমি ঢেউয়ের মাথায় লাফ দিলাম। আমি আবার আছড়ে পড়লাম। এইভাবে চলার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই সমুদ্রের তীর আমার নজরে এল। আমি আবার ঢেউয়ের মাথায় লাফ দিলাম।

শেষে আমি বালির ওপর আছড়ে পড়লাম। আমি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। পমা,বৃতা আর সৌ দাঁড়িয়ে আছে। আমি ওদের কাছে গিয়ে বালির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম। ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল। পমার চোখে-মুখে উৎকণ্ঠার চিহ্ন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। পমা রাগত স্বরে বলল, তোমাকে আর দেখাই যাচ্ছিল না; আমাদের যে কি চিন্তা হচ্ছিল। কেন তুমি এতো দূরে গেলে ? তোমার কিছু হলে আমরা কি করতে পারতাম ? আমাদের অবস্থা কি হত তখন ?

আমি উঠে বসলাম। সৌ আর বৃতাকে একটু আদর করলাম। তারপর একটু হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, জান পমা, আমি এতক্ষণ একটা পাগলামির খেলায় মেতে উঠেছিলাম। আর যে খেলাতে হার-জিৎ নেই সে খেলার কোন মূল্যও নেই। শুধু শুধু নিজেকে কষ্ট দেওয়া। এভাবে আমি কোনদিন সমুদ্রে নামব না, তুমি দেখো।

বৃতা এইসময় হঠাৎ একটু চেঁচিয়ে উঠলো, বাবা তোমার পিঠে একটা স্টার লেগে আছে !

সঙ্গে সঙ্গেই পমা বলল, দেখি দেখি। তাই তো, একটা জেলিফিশ মনে হচ্ছে। তবে মৃত।

আমি বেশ অবাক হলাম, মৃত জেলিফিশ !

আমি ঠিক বুঝে উঠতেই পারলাম না ওটা কোত্থেকে এল। আমার পিঠে একটা মরা জেলিফিশ ! আমার গা-টা ঘিন ঘিন করে উঠল। কোথায় যেন পড়েছিলাম, জেলিফিশ নাকি বিষাক্ত। এই বিষ কি এখন আমার শরীরে ঢুকে যাচ্ছে ? উঠে দাঁড়িয়ে আমি দৌড়ে আবার সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম।

HOME

গল্প

জল

য়ুমলেম্বম ইবোমচা

(মণিপুরি থেকে অনুবাদঃ সদানন্দ সিংহ)

কতোকাল ধরে তৃষ্ণার্ত আমি। জল কোথায় পাই ? এতোবড় শহরে ভেতরে আমি কি জল পাবো না ? কি যে করি!

মাথার ওপর সূর্য জ্বলছে। সারা শহর জুড়ে আগুনের হল্কা। বৃহৎ উচ্চ অট্টালিকার ওপর থেকে নেমে আসা আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। এতো বড় রাস্তায় কিছুক্ষণের জন্যও পা রাখার জায়গা নেই! অজস্র গাড়ি হুস্ হুস্ করে চলে যাচ্ছে। এতো জোরে হাঁটছি আমি, তবু মনে হয় আমি যেন এগোতেই পারছি না। মেশিনের তীব্র শব্দ কানে ঢুকে পশুদের জান্তব চিৎকার হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। চারিদিক থেকে ছুটে আসা তীক্ষ্ণ আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। ভালো করে চোখ খুলতেই পারছি না।

জল, একটু জল কোথায় পাই ?

লোকগুলি সব ছুটে চলছে। এতো উত্তাপ, সূর্যের এতো তেজ – কোনোদিকে তাদের খেয়াল নেই। তাদের যেন কারুরই তেষ্টা নেই। কিন্তু আমি যে কোথায় জল পাই ?

সেঞ্চুরি স্ট্যান্ডার্ড হোটেলে আমি ঢুকে পড়ি এবং একটা কেবিনে বসে পড়ি। একজন বয় এসে আমাকে জিজ্ঞেস করে, বলুন স্যার।

-- এক গ্লাস জল দাও শুধু।

-- শুধু জল ? স্যার ওটা কি মেনুতে আছে ?

-- নেই।

-- তাহলে কী দেবো ?

-- যা খুশি দাও। চা, কফি, স্কোয়াশ যা আছে সব দাও।

-- সব দেবো ?

-- দাও।

তারপর আমি চা, কফি, স্কোয়াশ, জুস – অনেক কিছুই খেয়ে বেরিয়ে আসি। তবু আমার তেষ্টা আর যায় না। আবার চক্কর দিতে থাকি রাস্তায় রাস্তায়। জলের খুঁজে। তেষ্টা বেড়েই চলে। হাঁটতে হাঁটতে আমার নজরে পড়ে, এ্যাপোলো রেস্তরাঁর দিকে। ভেতরে ঢুকে আমি আবার কেবিনে গিয়ে বসি। অর্ডার নিতে আসা লোকটিকে বলি জল দাও। লোকটা চলে যায়। কিছুক্ষণ পর একটা গ্লাস এনে টেবিলের ওপর রাখে। রঙিন পানীয়ের গ্লাসটিকে দেখে আমি জিজ্ঞেস করি, এটা কী?

-- জল।

-- আমি তো এই জল বলিনি।

-- এছাড়া আমরা অন্য জল চিনি না।

-- জল চেনো না ?

-- হ্যাঁ হ্যাঁ মশাই, আমরা অন্য জল চিনি না।

আমি টুক করে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে আসি। পেছন থেকে খিস্তি ভেসে আসে।

কিন্তু আমি যে জল কোথায় পাই ? তেষ্টায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

সামনে একটা থার্ড ক্লাস জাতীয় হোটেল দেখে আমি আবার ভেতরে ঢুকে পড়ি। ম্যানেজার আমাকে দেখে বলে ওঠে, বলুন স্যার, আপনার জন্যে কী করতে পারি ?

আমি বলি, কিছুই করতে হবে না। আমি শুধু এক গ্লাস জল খেতে চাই।

-- জল ! পাগল নাকি! এটা থাকার হোটেল। এখানে জল নেই। কোত্থেকে যে এসব উটকো লোক ঢুকে আসে।

-- হ্যাঁ হ্যাঁ থার্ড ক্লাস হোটেলের থার্ড ক্লাস লোকদের কাছে কেনোই বা জল থাকবে! বলেই আমি বেরিয়ে আসি। লোকটা আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আমি টের পাই, পা যেন আর চলতে চাইছে না। কিন্তু আমি যে কী করি এখন!

হঠাৎ পেছন থেকে এক মেয়েলি কণ্ঠের ডাক শুনতে পাই, একটু দাঁড়াবেন? ফিরে দেখি এক সুন্দরী মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে ফিরে দাঁড়াতে দেখে মহিলা বলে ওঠেন, কি খুঁজছেন আপনি?

-- জল। আমি খুব তৃষ্ণার্ত।

-- জল! আসুন আমার সঙ্গে।

মহিলা আমাকে কাছের একটা ফ্ল্যাটের খুব সুন্দর ড্রয়িং রুমে বসিয়ে দিয়ে একটা খুব সুন্দর ঝকঝকে গ্লাস নিয়ে এসে আমার দিকে এগিয়ে ধরে। আমি জিজ্ঞেস করি, এটা কী ?

-- আপনি যা চাইছেন।

-- আমি তো এটা চাই নি।

-- আপনি কী চাইছেন তাহলে ?

-- জল।

-- এটা তো জলই।

-- না, এটা না।

মহিলা আমার দিকে চোখ গোল করে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, পাগল কোথাকার। চলে যাও এখান থেকে। বলে আমাকে বের করে দিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়

এই সময় দেখি একজন ফিটফাট পোশাক পরা ভদ্রলোক আমার দিকেই আসছে। আমি বলে ওঠি, একটু শুনবেন?

লোকটি দাঁড়ায়। উত্তর দেয়, বলুন।

-- এই শহরে জল কোথায় পাওয়া যাবে ?

লোকটি কোনো উত্তর না দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যায়। তা দেখে একজন পথচারী এগিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করে, কী খুঁজছেন ?

-- জল।

-- আসুন।

আমি লোকটার পেছন পেছন যেতে থাকি। লোকটা আমাকে একটা ঘরে বসায়। তারপর আমাকে একটা গ্লাস এগিয়ে ধরে। আমি জিজ্ঞেস করি, কী এটা ?

-- জল।

-- না। এটা জল নয়।

-- পান করুন। তৃষ্ণা চলে যাবে।

-- না।

আমি তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে আসি। জল, আমার জল চাই। আমি খুব তৃষ্ণার্ত।
সামনে একজন যুবককে দেখে আমি বলে ওঠি, শুনবেন একটু।
-- বলুন।
-- এখানে জল কোথায় পাওয়া যাবে।
-- জল ? জলে জলাকার এই শহর। যেকোনো হোটেলে চলে যান।
-- পাই নি। আমি যে জল চাই সে জল পাইনি।
-- তাহলে যে জল পাওয়া যায় না, সেটা খুঁজছেন কেন ?
যুবকটি চলে যায়।
একজন লোক আমাকে দেখে দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করে, কী খুঁজছেন ?
-- জল খুঁজছি।
-- পাবেন না। অনেক আগে থেকেই পাওয়া যায় না। তবু আপনি উনার কাছে খোঁজ নিতে পারেন।
বলে লোকটা একজন বৃদ্ধলোকের দিকে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দেয়।
আমি তাড়াতাড়ি বৃদ্ধলোকটির দিকে এগিয়ে যাই। আমাকে দেখে উনি বলে উঠেন, আসুন আসুন। কী চান বলুন।
-- দয়া করে আমাকে একটু জল দিন।
-- জল ? আচ্ছা বসুন।
আমি কাছে গিয়ে বসি। উনি আমাকে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করেন, জল খুঁজছেন ?
-- হ্যাঁ। সারা শহর খুঁজেই আপনার কাছে এলাম।
-- কেন জল খুঁজছেন ?
-- আমি খুব তৃষ্ণার্ত।
-- সত্যিই তৃষ্ণার্ত ?
-- হ্যাঁ, খুউব। আপনার কাছে যদি থাকে দয়া করে দিন।
-- আমার কাছে কোত্থেকে থাকবে ? জল দেবার ক্ষমতা থাকলে কি আমি এভাবে থাকতাম! শহরে আপনি জল পাবেন না। কোনোখানেই না। শহর তৈরি করার সময় সমস্ত নদীর পাঁপড়িগুলি শুকিয়ে ঝরে গেছে। তবে শহরটা পেরিয়ে গেলে জল পাওয়া যেতে পারে। পারবেন যেতে ?
-- পারবো। অবশ্যই পারবো।
আমি বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু আমি যেন এক ধাঁধার মধ্যে পড়ে যাই। শহরের মধ্যে আমি শুধু পাঁক খেতে থাকি। বেরুবার রাস্তা আর খুঁজে পাইনা।
অবশেষে আমি শহরের শেষ প্রান্তে এসে যাই। কিন্তু আমি পার হতে পারি না। চারিদিকে শুধু ইটের সারি। উঁচু উঁচু সারি। চেষ্টা করেও আমি ডিঙোতে পারি না।

জল, আমার জল চাই। আমি খুব তৃষ্ণার্ত। আমার জল চাই-ই। এই শহরে, এই রুক্ষ ইটকংক্রিটের ভেতরে আমার জল নেই। ইটের সারি পেরোলেই হয়তো জল পেয়ে যাবো। সত্যিই পেয়ে যাবো। আমি কতোকাল ধরে তৃষ্ণার্ত। কী করে আমি জল পাই। আমার যে জল চাই।

(য়ুমলেম্বম ইবোমচা মণিপুরের একজন বিশিষ্ট কবি ও গল্পকার। জল গল্পটি লেখকের একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯৯১) ছোটগল্পের বই ‘‘নুমিত্তি অসুম থেঙজীল্লকলি’’ থেকে নেয়া)

HOME

গল্প

দখিন-দুয়ার খোলা

নীহার চক্রবর্তী

‘অনেকবার বলেছি তোকে, হারু। ওই বাড়ির দিকে একদম তাকাবি না। জানিস না ওই বাড়িতে একটা সোমত্থ মেয়ে আছে ? ওর বাবা-মা দেখে ফেললে কেলেঙ্কারি ঘটে যাবে একটা।’
হারুর মা খুব মেজাজের সঙ্গে বললেও হারু দিব্যি দাঁত বার করে হাসতে থাকলো।
মা ওর হাসি দেখে খুব রেগে উঠে বলল তখন, ’তাহলে দেখছি তোর বাবাকে বলতেই হচ্ছে আমাকে। এমন কেন তুই, শুনি ? আমাদের মান-সম্মান দেখছি আর রাখবি না তুই।’
হারু সাথে-সাথে ওই বাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে ওর মাকে হেসে বলল, ’বাবাকে বলার আগে একবার ওইদিকে তাকিয়ে দেখো। কি যে অবস্থা।’

হারুর মা ওই বাড়ির দিকে তাকিয়ে খুব অবাক হল। সেই সোমত্থ মেয়েটা ওদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ফিকফিক করে হাসছে দুজনের দিকে তাকিয়ে।

তখন হারু মাকে বলল সহাস্যে, 'এই তো অবস্থা। দেখো মেয়ের কায়দা। আমার আর কি দোষ, বল। চল এখান থেকে ঘরে। ওখানে গিয়ে কথা হবে।'
হারুর মা আর একবার এক পলক মেয়েটাকে দেখে একটু বিরক্তি মুখে ঘরে চলে গেলো হারুকে সাথে নিয়ে।

এবার ঘরে বসে হারুর মা হারুকে বোঝাতে শুরু করলো।
পইপই করে বলতে থাকলো, 'সময় ভালো নারে, হারু। এখন সবাই ছেলেদের দোষ দেখে। তাই তোর মেয়েটার দিকে আর না তাকানোই ভালো। আর আমরা তো ব্রাহ্মণ। ওদের সঙ্গে চলে আমাদের ?'
এবার হারু ঘরের খোলা জানলার দিকে তাকাতে তাকাতে আনমনে বলতে শুরু করলো ওর মাকে, 'কি যে অবস্থা গো। আবার সেই মেয়েটা। বারান্দা হল না। এবার ওদের একতলার ছাদ থেকে আমাদের ফলো করছে। মুখে আবার মিষ্টি-মিষ্টি হাসি। আমি হাসলেই বুঝি যত গণ্ডগোল। ধুর... ভাল্লাগে না ছাই। এবার রান্নাঘরে চল।'
হারুর মা সবিস্ময়ে মেয়েটাকে দেখে ভীষণ রকম বিরক্ত হল। অনেকক্ষণ ওদের ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকলো। তবে মেয়েটাও আর দেরী করলো না। হাসতে হাসতে নীচে নেমে গেলো সে।

তারপর ঘোর কাটতে হারুর মা হারুকে জিজ্ঞেস করলো, 'হ্যাঁরে হারু। এখন রান্নাঘরে যাওয়ার কী আছে ? একটু আগে খেলি না তুই ? আবার খিদে পেলো নাকি তোর ?'
মার কথা শুনে হারু হেসে ফেলল।
হাসতে হাসতে বলল মাকে, 'না গো। তা নয়। খিদে তেমন ছিল না। ওই মিষ্টি মেয়েটাই খিদে পাইয়ে দিলো। তবে আমিও কম মিষ্টি না। কী বল ?'
ওর মা শুনে খুব মজা পেলো।
মুখে হাসির ছটা নিয়ে জবাব দিলো, 'বেশ দারুণ ব্যাপার তো। এমন করেও বুঝি খিদে পায় ? কে জানে। আর যা বলেছিস। মিষ্টি মেয়েই বটে। দেখা হলে খুব সুন্দর কথা বলে আমার সঙ্গে। তোর বাবারও নাকি ভালো লাগে ওকে। তা বটে। তুই বা কম মিষ্টি কীসের ওর থেকে ? কিন্তু ওর বাবাটাকে নিয়ে খুব ভয়। বড় নেতা। বুঝে গেলে কি করতে কি করে ফেলে কে জানে।'
হারু হেসে উত্তর দেয়, 'কি আর হবে। কিছু একটা হবে। চাকরীর যা বাজার। আমার চাকরীও জুটে যেতে পারে। তাই না ?'

সঙ্গে-সঙ্গে দেখা গেলো হারুর মার সারামুখে খুশীর নিরবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ। তখন বোঝাই গেলো তার অসবর্ণ প্রেম আর বিয়েতে কোন আপত্তি নেই। চাকরি বলে কথা। এখন শুধু হারুর বাবাকে একটু পইপই করে বোঝানো।

হারু আর হারুর মা ঘর থেকে বারান্দায় আসতেই দেখা গেলো সেই মেয়ে ওদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। বুঝি কান পেতে আছে কোকিলের কুহুতানের দিকে। খুব কাছের কোন গাছ থেকে সেই সুর ভেসে আসছে।
হারু সেদিকে তাকিয়ে এক-গাল হেসে বলে উঠলো ওর মাকে, 'কি যে অবস্থা।'
মা চোখ গোল গোল করে বলে উঠলো সাথে-সাথে, 'কি আবার অবস্থা। সবই তো ঠিক আছে।'
সাথে-সাথে অট্টহাসিতে ফেটে বলে উঠলো, 'তাহলে বাবা বাড়ি আসলেই ব্যবস্থা ?'

শুনে হারুর মার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেলো। হারুর মুখে তখন আর হাসি ধরে না।

HOME

গল্প

অযান্ত্রিক রিলোডেড

বৈদূর্য্য সরকার

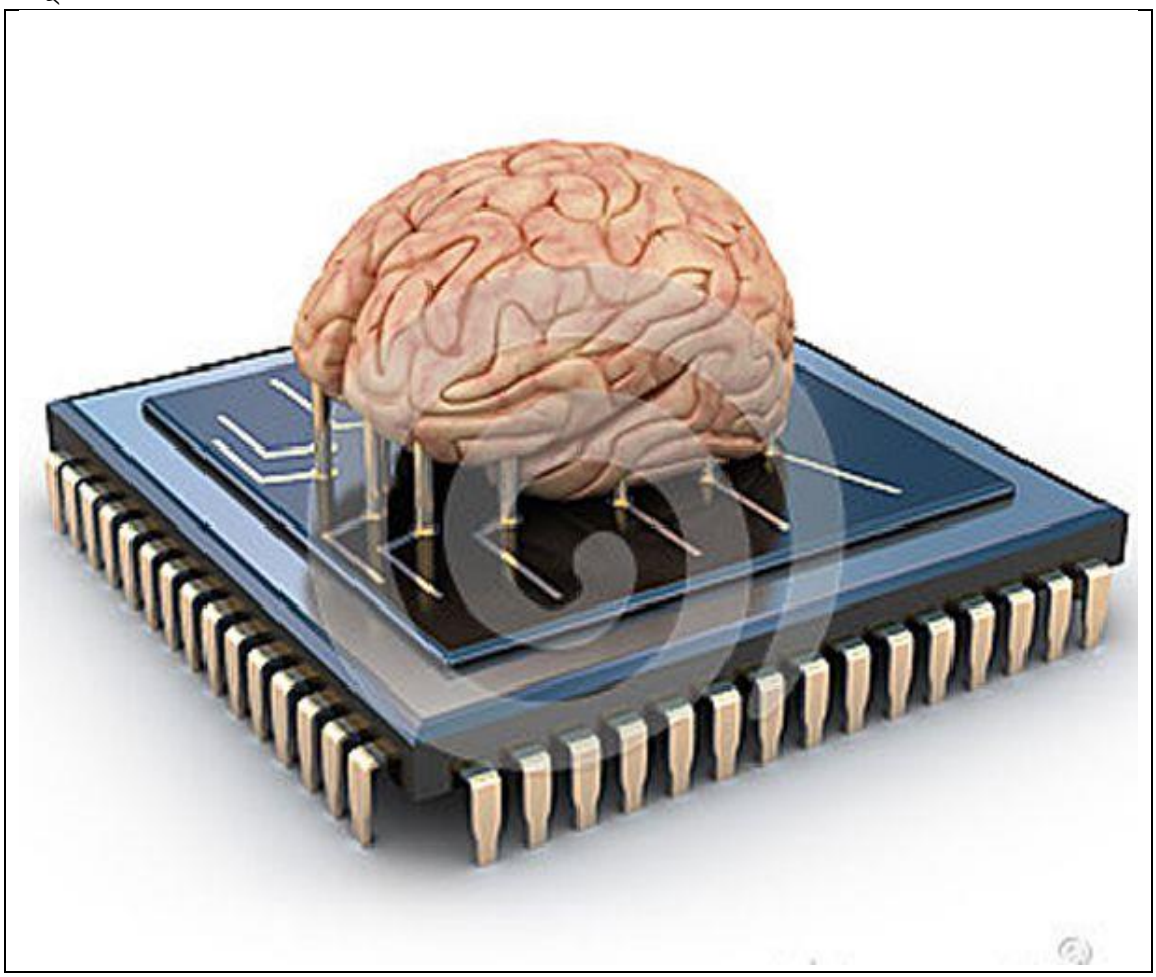

ফ্লপি ড্রাইভের যুগ থেকে আজকের ওয়াইফাই বিবর্তনের পুরোটাই নিজের চোখে দেখেছে তুষার। যথেষ্ট ডিগ্রি না থাকলেও লম্বা অভিজ্ঞতার জোরে আজ ও প্রজেক্ট ম্যানেজার। এখন জয়েন করা ইঞ্জিনিয়ারদের আন্দাজে ওর মাইনে তেমন কিছু না হলেও দিব্যি চলে যায়। মফস্বলের ছেলে বলে নিজস্ব গাড়িবাড়ির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। ও বিশ্বাস করে মরে যাওয়াটা খুব সাধারণ একটা ইভেন্ট হবে – কোনও পিছুটান নেই, শুধু একটা অখ্যাত কোম্পানির ডেটাবেসে বা ডিজাইনে থেকে যাবে ওর নাম। ওর প্রথম বসের কাছে শেখা একটা কথা ও সবসময় মনে রাখে – ‘‘টেকনোক্র্যাটের কোনও ছলচাতুরির ক্ষমতা নেই... সব সত্যি থেকে যায় যন্ত্রের পেটে’’। শেষের দিকে উনি বলতেন,

“বেশ কিছুদিনের পর যন্ত্ররাও একটু করে কম্যুনিকেট করবে... তোমাকে বুঝবে, তুমিও ওদের বুঝতে পারবে”।

শুনে তখন সবাই হাসাহাসি করলেও এখন তুষারের মনে হয় যন্ত্রকে সত্যিই ও একটু একটু করে বুঝতে পারে আজকাল। সার্ভারে একটা এন্টার দিতে দেরী হলে মেশিনও যেন একটু স্লো হয়ে যায়। অভিমানী প্রেমিকার মতো খুনসুটি করে। যদিও সেসব কাউকে বলা যায় না। এমনিতে ওকে সবাই আড়ালে পাগল ছাগল বলে। কারণ প্রজেক্টের সময় রাত একটা দু’টো অব্দি অফিসে থেকে আবার পরদিন আটটায় চেম্বারে ঢোকে। এর’ম ম্যানেজার মাথার ওপর থাকলে যা হয় - সবার সুতো বেরিয়ে যায়। অথচ তুষারের কোনও ক্লান্তি নেই। ঠান্ডা চেম্বারটাকে ওর সবথেকে কমফোর্টেবল জায়গা বলে মনে হয়। টপ ম্যানেজমেন্ট পেছনে হাসাহাসি করলেও তারা জানে গত দশ বছর যাবতীয় প্রজেক্ট উতরে দেওয়া লোককে চটিয়ে লাভ নেই।

তুষার যখন কোম্পানিতে জয়েন করেছিল, এটা একটা সাদামাটা মেক্যানিকাল ইন্সট্রুমেন্টের কোম্পানি ছিল। কিন্তু সময়ের পালস্ বুঝেছিলেন মিঃ সেন। তখনকার ম্যানেজিং ডিরেক্টার। তুষারদের মতো ছ’জনকে নিয়ে আইটি ইউনিট চালু হয়। ওনারই উৎসাহে ও চাকরির সাথে চাটার্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কমপ্লিট করে। তখনও অবশ্য অন্যান্য ইউনিট হেডরা তুষারদের গুরুত্ব দিত না – মালিকের খেয়াল বলে উড়িয়ে দিত।

নতুন সহস্রাব্দে দেশ জুড়ে শুরু হওয়া আইটি রমরমার যুগে দু’হাজার সাল থেকে আইটি-র আলাদা সেটআপ তৈরি হয়। সেখান থেকেই এ কোম্পানি। প্রথম থেকে আছে বলেই নেটওয়ার্কের আইপি থেকে শুরু করে পুরো টেকনিক্যাল ব্যাপারটা তুষারের ব্রেনে ম্যাপ করা আছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্বার্থপরের মতো ও কিছু ট্রিকস অন্যদের জানাতে চায়নি। মিঃ সেনের পর ওনার ছেলে এমডি হয়ে তুষারকে কখনও ঘাঁটানোর চেষ্টা করেনি। তার একটা কারণ ছিল – তুষার ওর বাবার মনোনীত। দ্বিতীয়ত, একটু একটু করে বড় হওয়া কোম্পানির ফ্লোরে একটা বড় সময় কাটানোর পরেও ও লয়্যাল। উইকএন্ডে সামান্য মদ, কাজের নেশা আর প্রথম যৌবনের অবশেসন রূপসা – এর বাইরে তুষারের চরিত্রে কোনও অদলবদল নেই। এর’ম লোক বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এক জায়গায় থেকে যেতে পছন্দ করে। ফলে ওকে কোম্পানি যেমন অনেক কিছু দিয়েছে, তুষারও তার সবটা দিয়ে দিয়েছে কোম্পানিকে।

২

মফস্বলের ছেলে তুষারের কলকাতায় পড়তে আসাটা কোনও বিশেষ ব্যাপার না হলেও থার্ড ইয়ারে বাবা মারা যাওয়া, সদ্যবিবাহিত দিদির শ্বশুর বাড়িতে লোক লৌকিকতা বা মাকে টাকা পাঠিয়ে

কলকাতায় টিকে থাকা খুব সহজ ছিল না তুষারের পক্ষে। সেই কঠিন লড়াইটা ক'বছর লড়তে হয়েছিল। ফলে স্বাভাবিক শখ আহ্লাদগুলো বাকী পড়ে গেছে। তবু তারই মধ্যে রূপসার সাহচর্য অমুল্য ছিল ওর কাছে। যে কারণেই হোক রূপসা ওকে পছন্দ করত। কলেজে পড়ার সময় নাইন্টিন ফর্টিটু লাভ স্টোরির গান শুনিয়ে তুষার ওকে বলেছিল 'আইস্তা আইস্তা বাড়তা নেশা ...'। রূপসা হেসে উত্তর দিত, ''তুই ভুল জায়গায় ভুল কথাটা বলিস''। এখানে সিকোয়েন্সটা হবে- ''মুঝকো পাতা হ্যায়, তুমকো পাতা হ্যায়''। তুষারের ব্যস এক রূপসা ছিল। কিন্তু দুজনেই জানতো এই আটপৌরে সম্পর্কের কোনও পরিণতি নেই। সব দিক থেকে সাধারণ তুষার তখন চাকরির চেষ্টা করছে, রূপসাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়তে হল সরকারি অফিসার বিকাশবাবুর সাথে। পরে ওনার সাথে তুষারের দু'চারবার কথা হয়েছিল। যদিও ততদিনে তুষার স্বাভাবিক নিয়মে সবকিছু মেনে নিয়েছে। কেননা ওর কাছে ভদ্রভাবে বাঁচার লড়াইটাই ছিল প্রধান।

প্রায় পাঁচ বছর বাদে হঠাৎ রূপসার সাথে দেখা হয়েছিল ধর্মতলায়। দু'জনেই চোখ মুখের উত্তেজনা চেপে ফোন নম্বর বিনিময় করে। আস্তে আস্তে পুরনো ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে যদিও দুজনেরই মধ্য তিরিশ। রূপসা বারবার তুষারকে সেটল করতে বলতো। তুষার বুঝতে পারতো রূপসা ওর জীবনটা কল্পনামাফিক রাস্তায় হাঁটতে পারেনি। তখন জীবনে কিছুটা স্থিরতা, দুএকটা চুলে পাক...শরীরে চর্বির ছোঁয়া। রূপসারও শীতল দাম্পত্যে বা দায়দায়িত্বে দ্রুত বয়স বেড়েছে। কলেজজীবনের মতো না হলেও, একটা মায়া যেন চাগাড় দিয়ে উঠেছিল দু'জনের। শারীরিক তৃপ্তি থেকে পালানো আবার ধরা পড়া ... তার মধ্যে লুকিয়ে ছিল একটা দীর্ঘকালীন মায়া। একটা বয়সের পর যে কারণে পুরুষের দরকার হয়।

সস্তা বারে মদ খাওয়ার পর তুষারের আজকাল রূপসাকে দরকার হয় খুব। কখনও পায় কখনও পায় না। এ বয়সে শুধু যে শরীরের টান – মানতে চায় না তুষার। রানটাইম এররের মতো একটা ব্যাপার যেন, ধরা না গেলেও যন্ত্রণা থেকে যায়। রূপসার দিক থেকেও সংসারে জড়িয়ে পড়ার পর সম্পর্কের জন্য সবকিছু ছেড়ে আসা সহজ নয়। কিন্তু নিজেকে বিকাশের নিস্ফল আলিঙ্গনে ধরে রাখতে পারেনি। অক্ষমতার কারণে ন্যুজ বিকাশ না বোঝার ভান করে থাকে আজকাল।

৩

প্রজেক্ট হেড হওয়ার পর চেম্বার ছাড়া একটা সর্বক্ষণের গাড়িও পেয়েছিল তুষার। গাড়িটা পাঁচ বছরের পুরনো, ড্রাইভারও একই। কারণ ড্রাইভার সুবল তুষারের গতিবিধি খুব ভাল করে জানে । শনিবার সন্ধেয় বারে যায় ও। ওয়েটাররা সব চেনা, তুষারের ব্র্যান্ডও জানে ওরা। এটাও জানে কোণের একটা টেবিলে বসে, কাঁচা ছেলেপুলের ভিড় এড়িয়ে চলে। রূপসাকে নিয়ে যদিও দু'চারবার বড়

জায়গায় গেছিল, কিন্তু নিজের জন্য বেশী খরচ করতে ইচ্ছে করে না। তাছাড়া এখানে মাঝবয়সী লোকেরাই বেশী আসে।

যদিও এই তুষার একটু একটু করে বদলেছে। রূপসা বুঝতে পারতো পুরুষ হয়ে ওঠা তুষারকে কলেজের ছেলেটার সাথে মেলানোর চেষ্টা বৃথা। তুষারের মা মারা যাওয়ার পর দিদি বা আত্মীয়স্বজনের সাথে ক্রমশ যোগাযোগ কমে যাওয়ার কারণ ছিল ব্যবসায়িক। সামান্য চাকরি করা তুষার অনেকটা আনওয়ান্টেড ছিল সবার কাছেই। সেটাই মেনটেন করেছে ও। অবস্থা ফিরলেও কারুর সাথে যোগাযোগ রাখেনি। রূপসার ক্ষেত্রেও সের'ম হওয়ার সম্ভবনা ছিল। তুষার কোনোদিনই দিওয়ানা টাইপের ছেলে ছিল না । জীবনের নানা অভিজ্ঞতা তাকে মেলোড্রামা থেকে দূরে রাখলেও রূপসার ক্ষেত্রেই তুষার যেন অস্বাভাবিকভাবেই আবেগপ্রবণ।

৪

চল্লিশের দোরগোড়ায় এসে ঈষৎ পৃথুলা রূপসা তাই থেকে গেছে। তুষার উত্তেজিত হয়নি আবার নিঃস্পৃহও ছিল না। সময় কাটাচ্ছে একটু একটু করে। এখন ও বরং বুঝতে পারে রূপসার থেকেও মেশিন, সার্ভাররুমে তারের জঙ্গল, সুইচের কনফিগারেশান আর কোডের সমুদ্রে তুষার যেন বেশী সাবলীল। শেষের কয়েকবার রূপসার সাথে অসফল মিলনে কাতর হয়ে দেখত ওর সার্ভার যেন বেগরবাই শুরু করেছে। অন্য কেউ সামলাতে পারতো না। ওকে ছুটতে হত। অথচ পরদিন থেকেই 'কেমন দিলাম' মার্কা মুখে সব ঠিকঠাক ফাংশানিং।

তুষারের মাঝে মাঝে মনে হত - ও কি পাগল হয়ে যাচ্ছে! নির্ধারিত সময়মতো এন্টারের অদৃশ্য চাপে লোড হতে থাকা কোডের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করতো। মনে হত, মেশিনের ভাষা যেন ওর কাছে সহজ হয়ে আসছে। স্পষ্ট বুঝতে পারতো, সার্ভার বলছে – আমি তোমার মা, প্রেমিকা, তোমার সন্তান ...সবকিছু। তুষার পাগলের মতো বলত –"আমি ধারণ করে আছি এই সিস্টেম"।

*

এ গল্প যেভাবে শেষ হয় – এক্ষেত্রে কিন্তু সের'ম কিছু হল না। তুষার রিহ্যাবে যায়নি। কোনও প্রয়োজন হয়নি। দেখলেও কেউ তাকে চিনতে পারবে না। সেক্টর ফাইভ থেকে বেরনো লড়ঝড়ে গাড়িতে তাকে বসে থাকা দেখা যেতে পারে। মেট্রোয় আপনার পাশে বসে যে হোয়াটসঅ্যাপ করছে – তার নামও তুষার হতে পারে। হে পাঠক! চাঁদনির ছোটখাটো সার্ভিস সেন্টারে ওর খোঁজ আপনি না পেলেও পাইরেটেড ভার্সান নিশ্চিত খুঁজে পাবেন।

HOME

নকুল রায়ের দু'টি কবিতা

আলোর অসামান্যতার নিচে শায়িত লক্ষকীট

আমাদের মাসপয়লার বেতনসূর্য, তুমি দুর্দান্ত কোটি কোটি ভাগে বিভক্ত কেরানি-
কৃষ্ণের টারবাইন, ঘুরে যাও চক্রবৎ, নক্ষত্রের সগোত্রহীন আজ তুমি সহজ মানুষের
হাতের কাছে – দিগন্তের বৃহদায়তন সূর্যের শাসনযন্ত্রটি ভিখিরির হৃৎপিণ্ডেরও
সমতুল্য নয়, তুমি মিথ্যা তোমার পাত্রমিত্র নক্ষত্রশাসিত দিকমণ্ডল তোমাকে
আজ নিরুপায় স্তাবকবন্দনা করে, ঘাসের অগ্রভাগেই জেগে থাকে চটির আঘাত,
মৃত্যুর সুসংবাদ অনুবাদ ক'রে শোনায় জীবনের কু-চক্রী শিক্ষায়তন,

আমাদের সারল্যের চাবিগোছা তুলে নিয়ে গেছে অকালপক্ক জিরাফ, পশুরও
লোভ খাদ্য ও সঙ্গমের কাছাকাছি আত্মীয়সভা খুলে বসেছে, সিন্দুকের
টাকা লম্পটের ছদ্মবেশে ঘোরে-ফেরে – সুষমাযুক্তা এক রমণী তৈলাক্ত মাথায়
স্যূচ ঘ'ষে সেলাই করে যাচ্ছেন তাঁর বিদায়ী-পুত্রের স্বাগতম শয্যা, মানুষের
রক্তের ধারাপ্রবাহ থেকে দূরে বেশি কি কিছু আভিজাত্যের প্রদীপ জ্বালাতে
পারে ? সর্ষ কি নিজে থেকেই ভূত-খেদানোর অবয়ব ? মানুষের অজ্ঞতা ও
জনব্যবসার মাঝামাঝি ভূতেদের অবাধ সাম্রাজ্য – বুদ্ধির প্রখর তাপদাহে
জ্বলে মুর্খের আপাদমস্তক আশা, অত্যাশ্চর্য হতাশার আগুন এতো কোমল

এতো কুসুমলজ্জা – শ্রমের মানদণ্ডে শুধু হৃদয় নিস্তেজ হয়ে পড়ে
টাকার খোঁচায় বেড়ে উঠছে গর্ভবতী ব্যাঙ্ক, কর্পোরেশনের জলদণ্ড বেয়ে অবিরাম
পড়ছে তরলকথাকান্নাকাটি – প্রমিলালাইনে এইমাত্র প্রথম শাড়িপরা কিশোরী
ভাঙলো মধ্যবিত্ত কলসীখানি, গোমড়ামুখো চপলার চেয়েও নিষ্ঠুর চলতি মাসের
বেতনের ব্যথা, বাড়িভাঙা ও সুদের টাকা বিলিয়ে কয়েকজন
কেরানি আজ ভারতবর্ষের গালভাঙা মানচিত্র শিল্পনগরীর বড়াই গিলে খাচ্ছে

আমাদের মাথার ব্রহ্মতালু ভেদ করে উঠে যাচ্ছে জ্ঞানপাপীদের কল্পতরু,
স্মরণ করি ভাগ্য তোমাকে ছবি ও দর্শনে বাস্তবের কাঁটাতার ঘেরা
সাহেবের সৌখিন কৃষিব্যবস্থা, স্মরণ করি ভাঁড়ারে ইঁদুর তোমার
ইচ্ছায় অনিচ্ছায় দাঁতক্ষুধা, আমাদের ফুটোচালার নিচে হাস্যকর
সুর্যের রশ্মি তোমাকে হাত জোড়, আমাদের ঋণ থেকে ঘুম তুলে নাও

তৈলাক্ত খুঁটি বেয়ে ওঠানামা বানরের অঙ্ক

বুদ্ধি মিলিয়ে নয়, স্যূচ বিনিময়ে হৃদয়ের আক্যুপাংচার চাই,
চাই মানুষের চোখের ভেতরে স্রোত সুচারুচিকনচিকিৎসা, বানরের সম্বৃদ্ধি
আর সরল সুদকষা এ নিয়ে পাকস্থলী ভরে না এখন, প্রাগৈতিহাসিক
রক্তের বিনিময়ে চাই সর্বাধুনিক ব্লাডব্যাঙ্ক, কলমি শাকের চেয়েও
নম্রনেতানো কিশোর আজ পেয়েছে লৌহ পাথরের সংঘর্ষণ, প্রীতিযুদ্ধে
কেউ এখন সহমরণের ব্যথা অনুভব করে না, ভিখিরির সদিচ্ছাকেও
দিয়েছি অবশিষ্ট ব্যথা, সমুদ্রঢেউ প্রথমে হৃদয়-বিছিন্নতার পরই
দেখা দেয়, মানুষ শুধু অঙ্কের হিশেবে আজ লাইফ ইনস্যুরেন্স খোঁজে

কে তুমি প্রতাপ অনুতপ্ত যাবজ্জীবন খণ্ডযুদ্ধের খোলা তরবারি, কে
আছো দেদীপ্যমান সময় সোহাগধন্য বানপ্রস্থগামী বোধের লালসা,
কে সেই উৎকট দুর্গন্ধহীন মুক্তিযোদ্ধাসাঁড়াশিহস্তধৃত সুপুরুষ, তবে এসো
ময়দান ভু-দান যাবতীয় যজ্ঞধর শিল্প সংস্কৃতির উদগ্র কামনা

তুমি আমাকে পোড়াও, আমাদের ফাঁকামাথা দেয়ালে ঝুলিয়ে
বলো আমাদের ড্রামসভ্যতার সমস্ত পীচ সব গলে বেরিয়ে যাচ্ছে কেনো
সব ঠিক আছে সব ঠিক আছে শুধু ঠিক নেই আমাদের বিবেচনা,
অচেনা ইঁদুর কেটে যায় রীতার ড্রেসিং টেবিল, পরিশ্রমের আগেই
গণবিল দাখিল করার বাসনা, এসো না লক্ষ্মীটি তুমি কোথায়
হে বীরেন্দ্র সজীব খোলামেলা সর্বজনীন অসি ও কলম, অঙ্কের
হিশেব ছেড়ে এসে বসো না খুনটেবিলের বৈঠকে

HOME

কৃত্তিবাস চক্রবর্তীর দু'টি কবিতা

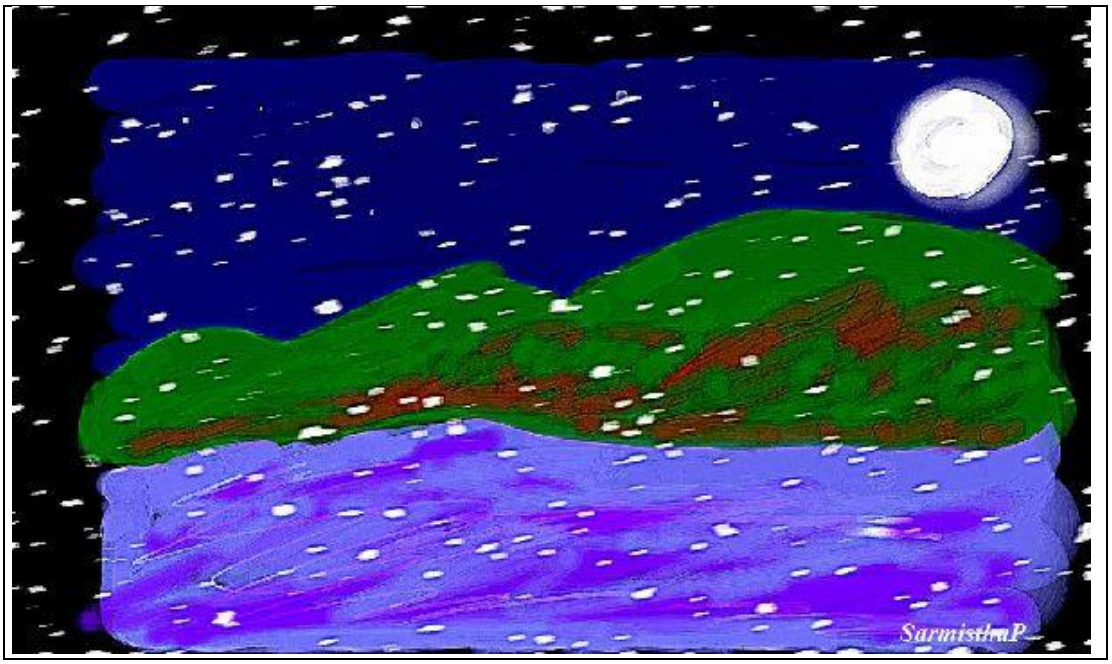

স্বপ্নগুলো

এক

মুখের ওপর ঝুলিয়েছি প্রচ্ছদ
স্বপ্নগুলো আঁকা আছে পর পর
গ্রন্থস্বত্ব দিলাম তোমায়
পাতাপত্র ঘেঁটে দেখো আলো আর কালিমার খেল
দেখো স্বপ্নগুলো তৈরী হতে কাঠখড় পুড়েছিল কতো
ধূলিসাৎ হতেই বা সময় নিয়েছিলো ঠিক কতটা

দুই

বৃষ্টি পড়ছিলো আমাদের চোখের ওপর
আশ্চর্য, চোখের ওপরই মেঘ জমে শুধু ।
চোখের জমিতে কি ধানচাষ হয় ?

খরা হলেও ওই ওখানেই।
তোমার ক্ষোভের দিনগুলো যখন আগুনে পোড়ে
কি রকম চৌচির হয়ে যায় এই বন্ধকী পরাণ

স্বপ্ন তুমিও দেখেছিলে ঠিক
শুধু, জানোনা তোমার স্বপ্নের সীমা
কবেই নিষিদ্ধ এলাকা বলে চিহ্নিত হয়ে আছে।

রোদ-বৃষ্টির গল্প

ছদ্মবেশের পোশাকগুলো ভিজে নেতিয়ে আছে কুয়াশায়
বন্ধুরা পোশাকগুলো জ্বেলে আগুন পোহায় শীতের রাতে
আগুন দেখে এগিয়ে আসে গাছতলার বুড়ো ভগবান
সে ঘরের গল্প শোনায়, দেশবাড়ি, আটচালা, বত্রিশ দুয়ার...

ভোর হয়, ক্রমে মাথার ওপর চামড়া-পোড়া রোদ
পবিত্র সূর্যালোক আড়াল করে
ছাতার কঙ্কাল খোলে বুড়ো
গল্পে মাতে ফের, সুখের আটচালা,
কাঠকেয়ারি, লোহাকাঠের খুঁটি...

একদিন,
যখন মেঘ জমলো ছাতার নিচে
এক অবিশ্রান্ত ধারাপতনের অপেক্ষায় ঝুঁকে পড়ে আকাশ
বলে বুড়ো,
যেদিন মা মারা গেলো, সে দুর্ভিক্ষের আগের বছর
জানেন, ঠিক এইরকম আকাশ...

HOME

সুবীর ঘোষের দু'টি কবিতা

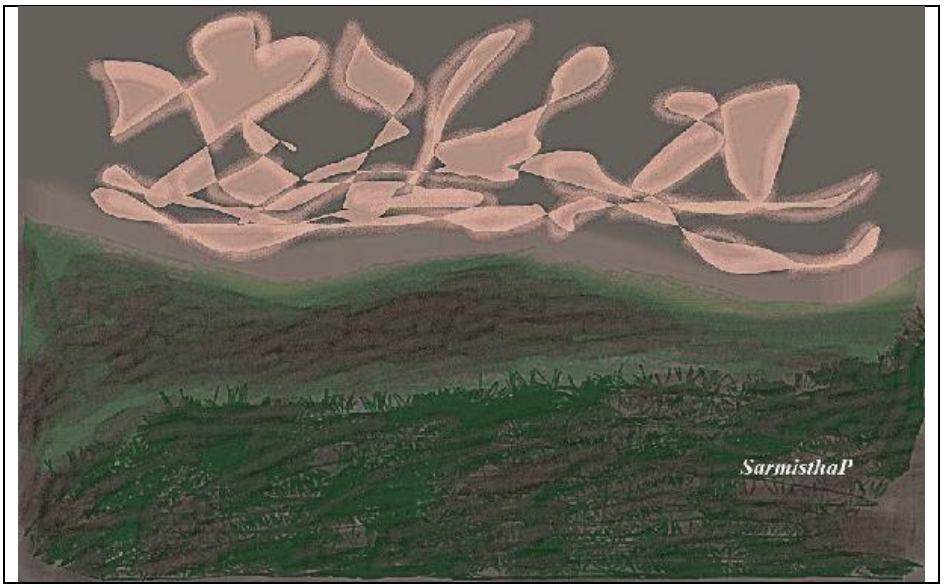

সাঁঝচুল্লি

রাত্রির পরীক্ষাগুলো কীভাবে উতরে যায়
কালো মেঘে ভরে আসা চোখ।
কীভাবে সবার সব জানাজানি হয়ে যায়
ঘরের সীমান্তে থাকা ছোটো এক উঁকির গহ্বরে!
আমি তো ছিলাম ভালো, নিরুপদ্রব, সকলের খোঁজের অতীতে
অতীত আমাকে খেল, বিপন্নতায় ভাসছে দেহস্রোত
মন্থনবেলার শেষে এক ফালি মুচকি রোদ আকাশের পশ্চিম কোণে
বহুদিন সঙ্গে ছিল যারা তারা যে ভালোই আছে
দেহে ও আমোদে, নিত্যদিন খুঁজে নিয়ে গুহার ঠিকানা
সে খবর কানে আসে; অন্তিমের পাখি কিছু কষ্টের গান গায় ডালে।
ভিনদেশি পথিকের গানে বাস্তুহারা পৃথিবীর মানচিত্র মেলে
পাশ ফিরে শোয় গুরুজন, নীরবে প্রস্থান করে বালিশের আশা
রক্তের কাঁচাদাগে কবেকার সাঁঝচুল্লি বিষতীরে উত্তাপ মাখে।

ভগ্নমান কবিতার শব্দগুলো

ফিরিয়ো না বিনা দামে পাওয়া উপলব্ধির অমোঘ কাজল,
হাতে রেখো, নিদেন রাখবার চেষ্টায় থেকো,
    অপচয় থেকে পাওয়া কিছু উদ্বৃত্ত ফসিল।
কপালে ঘাম জমে দুর্বাশার বুজকুড়ি জন্ম নেয়
জন্ম হয় কার্তিকের সূর্যবীজে মনে ও জঙ্গলে,
শত্রুনিধনের জন্যে তৈরি হয় যারা
তারা অকারণ হানাহানি করে মরে।
হাতে রেখো, নিদেন রাখবার চেষ্টায় থেকো,
     কিছুটা বিফল সময় ---
বেজন্মা নদীর ফালি ঝিরিজলে
     খলসে মাছের খুঁজে হাঁটু মুড়ে বসি।
আমার তিনটি দশক এক বৃহৎ খামের পেটে পুরে
চালান করেছে এক কৃষ্ণকায়
প্রস্তরবক্ষ ডাকহরকরার হাতে
পথের দুধারে যত কৃষ্ণচূড়ার ফুলে
নিদ্রার শিশির ঝেড়ে যেতে যেতে যে দেখে যেতে লাগলো
তিন দশক আগেকার
  ভগ্নমান কবিতার শব্দগুলোকে।

HOME

পিয়ালী বসুর দু'টি কবিতা

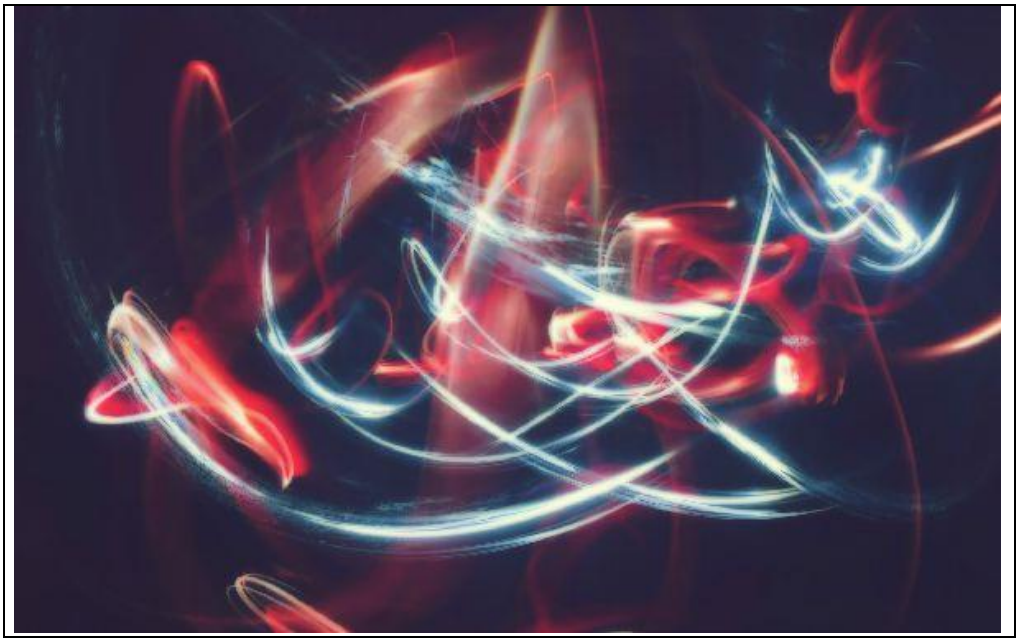

অতিরিক্ত স্মৃতির দাবীতে

একশ বত্রিশ বছরের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রেম
এখন নিয়নের উত্তাপে অপেক্ষারত

এ পাড়ায় বহুদিন সিলেবাসবিহীন অর্গ্যান বাজেনি
রাস্তার সব হ্যালোজেন নিভে গেলে ... মোমবাতি চেপে ধরা অন্ধকারে
শব্দের নিরন্তর সান্নিধ্যে ... শূন্যতা ভরাট হয়

ছায়ামূর্তি জড়ো হয়
সেঁকে নেওয়া অক্ষর ভ্রুকুটি নিক্ষেপ করে
ফেলে আসা সম্পর্কের আতসকাচে

সঙ্গহীন - দোসরহীন আলো
স্বপ্ন সম্ভাবনা পেরিয়ে অন্যতর এক জীবনের গল্প বলে
শোণিতের গাঢ় পদধ্বনি ...
মুঠোর ভিতরে রাখা মায়াময় অন্ধকার ছুঁয়ে দেয়

কাহিনী-শিথিল স্মৃতিভারে আক্রান্ত জীবন
হাল্কা ছায়াঘনায়মান আয়নায়
শেষবার দেখে নেয় ... ছেড়ে আসা বয়সের বাতিল ওয়ার্ড পাজল

সময় এবং

বন্ধ্যা সময়
প্রাচীন ধুলোর স্তবক পেরিয়ে
দৃষ্টি আপাতত প্রসারিত ফেলে আসা হিরণ্য-মুহূর্তে

আসন্ন আঁধারের যজ্ঞ থেকে চোখ চলে যায়
নির্মোহ ছায়ার প্রারম্ভ ধ্বনি-মল্লারে

শব্দ নয়
গতজন্মের প্রচ্ছন্ন মেঘ --- এ জন্মেই সম্পন্ন করে ছায়ার মড়ক

স্বপ্নসম্ভব বাতাসে লেগে থাকা বিষাদের শেষ ঘ্রাণটুকু নিয়ে
পরিচিত স্মৃতিনগরী ভেজা শার্সিতে শহরের জন্মদিন পালন করে

HOME

কুমারেশ তেওয়ারীর তিনটি কবিতা

কোরাস
রাত শেষ হয়ে সবে শুরু হচ্ছে ভোর

গাছ চাইছে তার ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হোক
করোটি থেকে উঠে আসা নিঃশ্বাস গিলে নিচ্ছে রোদ
আর ঘুমিয়ে পড়া মোমবাতি স্বপ্নে ভাবছে
ক্যান্ডেললাইট মোচ্ছবের কোনো উত্তরমালা নেই

শুধু কিছু প্রগলভ হ্যামলিনের বাঁশি হয়ে
সম্মোহন বাজায়

জমে থাকা জল কি ভুলে যাচ্ছে প্রতিফলন?
তবে কেন মরীচিকা পঞ্চভূতের কথা শুনতেই
হারিয়ে ফেলছে সংজ্ঞা

বরফ চাইছে গনগনে আগুন

কোমলগান্ধার

বাঘ শব্দে চমকে উঠছে কোমলগান্ধার
ফসলের মাঠে মেঠো ইঁদুর শস্যকণা
বয়ে নিয়ে যেতে যেতে রেখে দিচ্ছে
আচমকার গর্ভপাত
অথচ গর্ভিণীর পদভারে মাটির কান পাতা
কে পারে করতে অস্বীকার
ও অরুন্ধতী বাক্যালাপ থামিয়ে এবার সময় হলো
কাপালিকের ললাটে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দেবার

গরল

ভাজা মাছ উল্টে খাবার কথা বলে একটি বেড়াল
ঢুকে পড়লো রান্নাঘরে

মাছের কাঁটারাও প্রস্তুত হলো দাঁত ছোঁয়ার
একান্ত ও গোপন আতুরতায়

এ ব্যাপারে যার দূরদৃষ্টির কাছে জমা পড়তো
শ'য়ে শ'য়ে আবেদন পত্র
সেই জানালা অসহায় চেয়ে দেখলো শুধু
তার শিকগুলো এক এক করে খুলে চলে যাচ্ছে
ফসিলের অন্ধকূপে

HOME

মলয় মজুমদারের দু'টি কবিতা

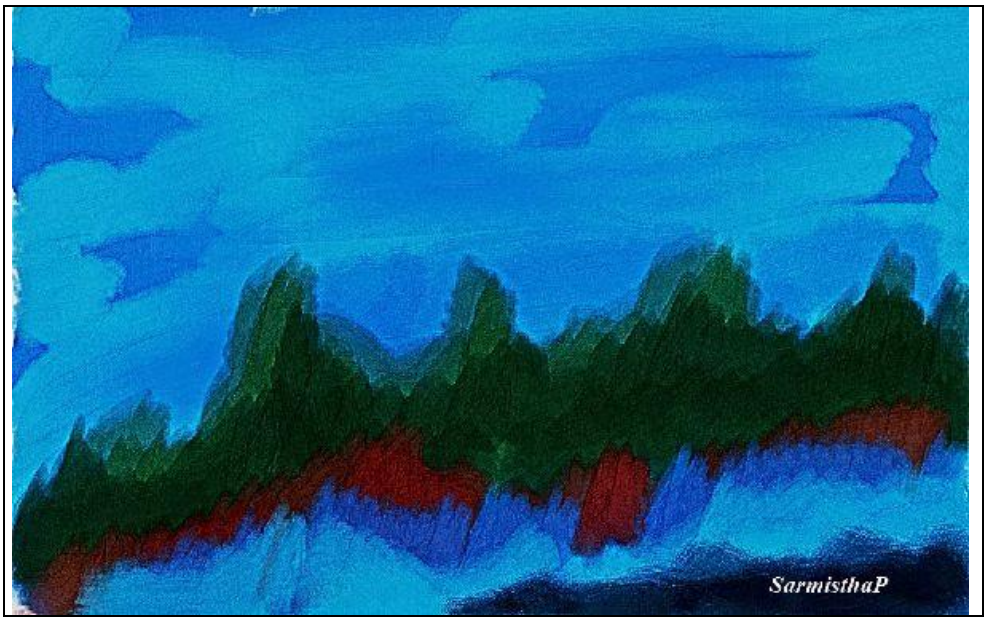

ফুল

ফুল, কত নামেই না তোমাকে ডেকেছে
ভোর থেকে সন্ধ্যার আলোতে
রাতের অন্ধকারেও তোমাকে ডেকেছে
কিছু মানুষ।

কত তোমার নাম
কতই না রঙের বাহার নিয়ে ফুটে ওঠো রাত্রিদিন
সকালের লাল রঙে তোমাকে মানিয়ে যায়
অথবা বিকালের সেই ডানা মেলা পাখিদের দলে,
কখনো শতাব্দীর আগুন জ্বালাতেও তোমাকে
দেখা যায় হলুদ বর্ণময় দেশে দেশান্তরে।

কখনো প্রেমিকার চোখের জলে ভিজে গেছে
তোমার পাপড়ির আলোকিত উঠোন,

কখনো হেসে উঠেছে উন্মাদ পৃথিবীর বুকে,
কখনো
বেয়নেটের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে তোমার নাভি,
কখনো ঝরে গেছো পুরুষের রোমশ হাতে।
অথচ অজানা থেকেছে দেশ
অজানা থেকেছে সুগন্ধের সোনালি আঁধার।

জামার বোতাম থেকে অজানা গলি পথে
ডেকেছে তোমাকে
বিপন্ন সন্ত্রাসও খোঁজে তোমার ঠিকানা
তাই তুমি ফুল,
ভুলের ঠিকানা নেই
আহত সারসের মতো একাকী যন্ত্রণা নিয়ে
ফিরে আসো বার বার দিগন্তের বাগানে।

পদ্যের আড়ালে

দুপুরের রোদ ছেয়ে আছে তোমার শরীর
আলোগুলো নিভে গেলে
তোমাকে ডেকে নেবে
নীল আলোর বিবর্ণতা তোমার ভাবনায়
ডুবে যাবে প্রেয়সীর চোখ ঘুমের জানালায়।

কখনো পড়ন্ত বিকেল ছুঁয়ে ফেলে
তোমার নাভি
কখনো মেঘেদের সাথে কথা হয়
কখনো ফুলেদের সাথে
ডুবন্ত কৈশোর চিনেছিল প্রথম তোমাকে,
এই ঘ্রাণে বাতাস জেনেছিল
সহজ দীঘির গান
চাঁদের বিষণ্ন সন্ধ্যায় রোমশ পুরুষে।

তবু আলোর পুঁথির ভাঁজে
খুঁজে পাই গাছেদের বিচিত্র রেখা
সেই সব বেনামী পঙক্তি এখনো আমার বুকে
চিন্তার মহাকাল এঁকে দেয়,
এখনো সুরের বন্যায় ভাসে শালিখের ঝাঁক
দুপুরের রোদে।

HOME

প্রণব বসুরায়ের দু'টি কবিতা

ইতিহাস ও জলের বুদবুদ

শব্দ কি এতই সক্ষম যে নিজেরাই
সাজিয়ে বসবে পংক্তি ভোজনে !

আমরা কলাপাতায় নৈবেদ্য রাখি
ধূপ জ্বালি, ফুলে দিই চন্দনের ছিটে
আর কোরা গরদের গন্ধে ঈশ্বরের
বায়ু আগমন ঘটে যায়-- ঘটাতে চাই বলে

শ্যাওলা ওঠা পুরনো বাড়িটায় গায়ে জন্মানো
বটের শিশু কোন ইতিহাস জানে না, ধূর্ততাও নয়---
শুধু তুমি জানো লক্ষ্মীর ঝাঁপি ও বাস্তুসাপের গর্ত
ঠিক কোথায় কোথায়--
যদি দক্ষিণের কক্ষ খুলে দাও আঁচলের চাবি দিয়ে

নতুন শব্দের জন্ম হবে
জন্মানোই ইতিহাস, বাকি সব জলের বুদবুদ..

বল তো উত্তর

কি আছে তোমার হাতে, পুঁই শাক, বরজের পান?
আমরা কি পেতে পারি যদি হই ভেঙে খান খান?

উত্তুরে হাওয়া চাই আর চাই মিঠে কড়া রোদ?
জবাব মিলবে তবে, হবে বুঝি সব শোধ বোধ?

আমাদের রাশি এক, লগ্ন তার রেখেছে স্বাক্ষর
বাস্তুভিটে কেন সাপ, জানো, বলো বল তো উত্তর...

HOME

অরুণিমা চৌধুরীর দীর্ঘ কবিতা

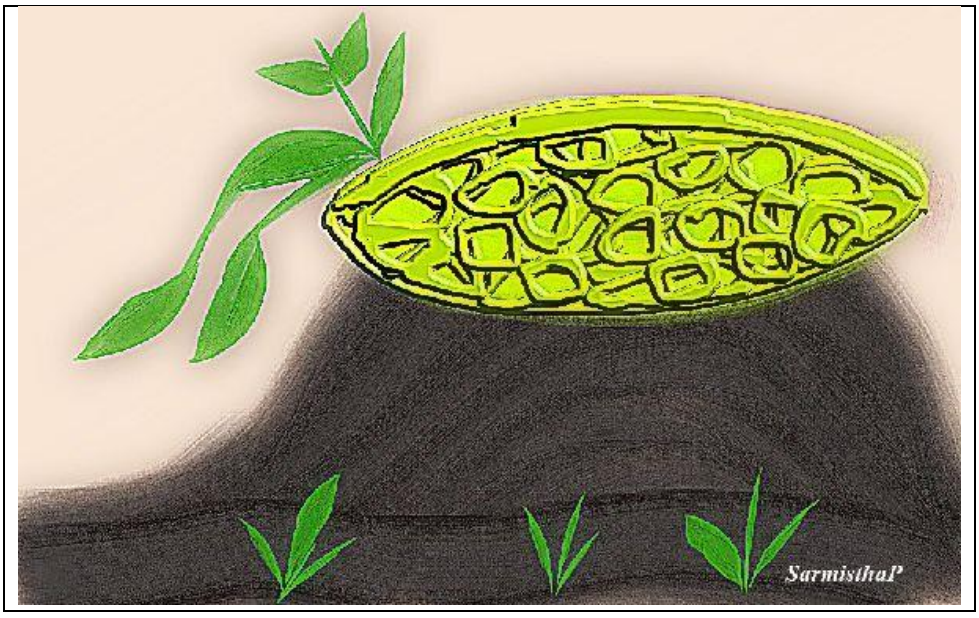

জুমাঞ্জি

তখন মঞ্চে কেউ ভালবাসা বিষয়ক
একটি মালগাড়ি আপ থেকে ডাউনে নিয়ে যাচ্ছিল
তার উজ্জ্বল সিডাকটিভ লিপস থেকে একটা লাল আলো বেরিয়ে এলে, তুমি বলেছিলে ’চলো ওঠা যাক’

আসলে আমরা তখন জুমাঞ্জি খেলছিলাম
আর বাংলা আকাদেমির গর্ভ থেকে সিঁড়িটা বেরিয়ে পেঁচিয়ে গিয়েছিলো আমগাছ তলার শুক্র নিরোধক গর্ভে
প্রথাগতভাবে আমি তোমার পক্ষ নিয়েছিলাম
এবং প্রতিপক্ষের মুখগুলো কুয়াশার চাদরে মোড়া ছিল

মঞ্চে মালগাড়ি তখনো ঘ্যাসঘোস শব্দে একটা প্রাচীন বেহালায় ছড় তুলে ব্যালাড গাইছিল
আর তার দৃশ্যমান লোভনীয় বিভাজিকা বেয়ে
ভিজে যাচ্ছিল চাঁদের আলো
তোমার ট্রাউজার ভিজে উঠতেই আমরা সিঁড়ির
দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম

আমাদের খেলাটা তখনো চলছিলো কেননা
আমাদের লিপস লক পজিশন জিপারে আটকে
একটা ভজকট চাল পড়েছিল,
যার মানে হ্যাঁ-ও হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে

সিঁড়িতে সেদিন অনেক মেষপালক
তাদের ভেড়াগুলো হারিয়ে গিয়েছিল
নন্দনের পিছনে গাঁজাগলির আড্ডায়, এব্যাপারে আমাদের গোপনীয়তা রক্ষা করতে বলা হয়েছিল

আমরা নেমে আসছিলাম আলাদা আলাদা কারণ আমাদের কথাগুলো নিকোটিনের গোল্লা গোল্লা রিঙ হয়ে হাত ধরাধরি করে উড়ে গিয়েছিলো
বুড়ো মুচিটার কাছে, যার কাছে পাসওয়ার্ড রাখা ছিল যেখানে আগের দিন রাত বারোটায় আমার একটি পা সিন্ডারেলা হয়ে গিয়েছিলো, আর তুমি দেরিদা আওড়েছিলে

একটু পরেই একটা উড়ালসেতু আমাদের নিয়ে এসেছিল ময়দানের ঝুপসি অন্ধকারে

আমরা আবার ছকটা পাততেই চিড়িয়াখানা থেকে বেরিয়ে এসেছিল লাস্যময়ী দুটি জেব্রা

তাদের তীক্ষ্ণ মেটিং কলে তোমার চশমার রেজিলেন্স টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছিল লেকের জলে
আর তোমার মুখটা হয়ে উঠেছিল এক আশ্চর্য জাদুকর

আমি দেখছিলাম আমাদের মাঝখানে একটি তুমুল জেব্রাক্রসিং ততক্ষণে শুয়ে পড়ছিল
আর এক কেটলি রমণজল তার মুখে ঝরিয়ে তুমি হেসে উঠছিলে, "দি ওয়াটার অফ ইন্ডিয়া"...

আচমকা স্ট্রিট ল্যাম্প নিভে গিয়েছিল এবং গর্ভবতী জেব্রা বা চাঁদের পেট ভরে উঠেছিল ফাটা দাগে

খেলাটার এইখানে এসে তোমাকে জাস্ট
হারিয়ে ফেলেছিলাম অনিন্দ্য!
আর তোমার দেওয়াল জুড়ে ফালিফালি স্তনের নিরুদ্দেশজনিত বিজ্ঞাপন জারী করা হয়েছিল

আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না
ধীরেধীরে রাস্তাটা ডুবে যাচ্ছিল খাদে

সেই ষাটবগির মালগাড়িটা আমার করোটির উপর দিয়ে ছুটে যেতে যেতে ভালবাসা বা কবিতা বিষয়ক একটি ভাবগম্ভীর শোকপ্রস্তাব সেইমুহূর্তে শেষ করে ফেলছিল

তোমার মুখের মতো একটা লোক রুমালে কয়েকটা কমজোরি স্লিপিং পিল গুঁজে দিয়ে বলছিল, "ডার্টি উওম্যান ফ্রম দি ফিলদি লিট কম্যুনিটি শুড ডাই লাইক আ ভালগার স্লাট"..তারপর ধীরেধীরে মঞ্চে পর্দা নেমে এসেছিল

আসলে এসমস্ত ঘটনা আমরা স্বপ্নে দেখছিলাম
হঠাৎ মঞ্চে লোডশেডিং হয়ে গেলে গর্ভবতী চাঁদের সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার পেটে চাকা চাকা দাগ ফুটে উঠে একটি জ্যান্ত সরীসৃপের মতো দেখিয়েছিল

অথবা জুমাঞ্জি খেলায় সচরাচর এরকমই ঘটে থাকে

HOME

লক্ষ্মণ বণিকের দু'টি কবিতা

ফুলচন্দন

সকাল ছড়িয়েছে আলো, সে আলোয় প্রতিভাসিত তোমার অনুভূতিমালা; আমি প্রাকৃতিক আলোতে আর তোমার শরীরী বিভঙ্গের কোরাসে জারিত হতে হতে কোন্‌সময় চোখের মাথা খেয়ে নিজেকে হারিয়ে বসি জানি না। একসময় সম্বিৎ ফেরে, সে তোমার তদারকির গুণ। যে চোখের মাথা খায়, সে চারপাশকে খুব কমই তোয়াক্কা করে। দায় সব তোমার ঘাড়ে বর্তায় বলেই সংসারের পাঁচ কর্ম ফেলে পড়িমরি ছুটে এসে আমাকে তরিপদ করার ভার আপন কাঁধে তুলে নাও; অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট হতে দাও না এ তো সেই আপ্তবাক্যেরই দ্বারস্থ হওয়া – স্থানকাল পাত্রপাত্রী নির্বিশেষে কাপড় তুলে যে বসে পড়ে চরম প্রাকৃতিক ডাকে ওর রাজ্যের বাজ পাখির মতো উড়ে গিয়ে বসে পড়ে সাতসমুদ্রতেরনদীর পারে ওদেরই মাথার ওপর। তোমার ভূমিকার গুরুত্ব ন্যায়সঙ্গত কিছুটা থাকলেও আমার অবস্থান স্রেফ উপলক্ষ মাত্র। যেমন সুসজ্জিত মঞ্চের উপস্থিতি ভুলিয়ে দর্শকশ্রোতার মন টেনে নেয় দক্ষ পাত্রপাত্রী আপন আপন অভিনয় গুণে। এই পরম্পরার মুখে ফুলচন্দন।

দৃষ্টিবিভ্রমের ফাঁকে

গড়া না-গড়া নির্বিশেষে সম্পর্ক এক জায়গায় নিজে-নিজেই পৌঁছে যায়
এই যাত্রাপথ পেরিয়ে আসায় নিজে কারো তোয়াক্কা করে না বরং
তুমি আমি আমরা সকলে ওকে ঘিরে বসবাস করি, ঘিরে রাখে
জ্বালানি কাঠ প্রজ্জ্বলিত শিখা যেমন

শিখরে বোধগম্যের বাইরে
সে কতটুকু বাড়বে না কমবে
সে কেবল প্রাকৃতিক এক টানে আলো তাপ বিকিরণ উৎসুক

মগ্নতার কাছে, উৎসুকতার কাছে মাথা নত করে নিজেকে দাঁড় করার সময়
জল, হাওয়া

HOME

দেবাশিস সাহার তিনটি কবিতা

শিকড়ের শিকল

শিকল ছাড়াই
শিকড় ছড়ায় শরীরে

বুনো রোদে পোড়ে আদর
কি করে এতো সাহস পায় জল

গম কি জানে সে খাদক

এই ভাবে আমরা খাদক হয়ে যাই

টের পাই না
কখন কিভাবে হাতে লেগে যায়
শিকড়ের রক্ত

অদৃশ্য বাতাসের শিকলে

জড়িয়ে আছি

ছেড়ে যেতে পারি না
এই লোভ লালসা আর
মাদকতা রঙের কামরাঙা শরীর

ভালো নেই

মা হারিয়ে
    কেঁদে কেঁদে পাথর বেড়ালছানাটি
আজ ভালো নেই সু
ঝড়ে হেরে যাওয়া পাখিদের
আজ মন ভালো নেই

সু ভালো নেই সেই মেয়েটি
যে হেরে গেছে অন্ধকারের কাছে

যেদিকে হাত বাড়ায়
উঠে আসে চাপ চাপ কষ্ট

এতো যন্ত্রণার মাঝেও
কী করে উঠে দাঁড়ায়
সেই গাছ রঙের ছেলেটি

আজ ভালো নেই কোনো মা
সন্ধ্যা হয়
ঘরে ফেরে পাখিদের দল
ফেরে না শুধু
মায়ের কোল আলো করা এক তারা

তুমি বলো সু

চারিদিকে এতো ধর্ম, এতো ধর্মস্থান
আমাদের কোন কাজে লাগে

ভালো নেই দেশের কোনো হাসপাতাল
আমাদের বিশ্বাসের আজ
কঠিন অসুখ

রাস্তাগুলো পঙ্গু
আমাদের গন্তব্যে নিয়ে যেতে পারেনা

এতো হিংসার ভার নিয়ে
আমাদের ধরিত্রী
আর কত দিন সবুজ থাকবে

অস্ত্রের মুখোমুখি
আর কতদিন
    আর কতদিন ঝরবে জীবন

সু তুমি বলো
চারপাশে চলছে রক্তহোলি
আমি কি আর সুন্দর থাকতে পারি

স্বপ্নডগা

ডানা মেরামত করে
আবার উড়ে যায় মেঘ

অনেক নিচু দিয়ে ওড়ে
বাবা রঙের ছাতা

মেঘ, রোদ, পাওনাদার কে

আড়াল করে
ভাঙা ডানা নিয়ে
    ক্যালেন্ডার পেরোচ্ছেন বাবা

কখনো কখনো বৃষ্টির জল
ভাঙা ছাতার ভিতর দিয়ে
বাবার গাল বেয়ে আমার বুক ভেজাতো

বাইরে এতো কষ্টের রোদ
টের পাইনি কোনদিন

রোদ্রে সাঁতার কাটতে কাটতে
পুরানো ডানায় বড় হতে থাকে
        স্বপ্নডগা

HOME

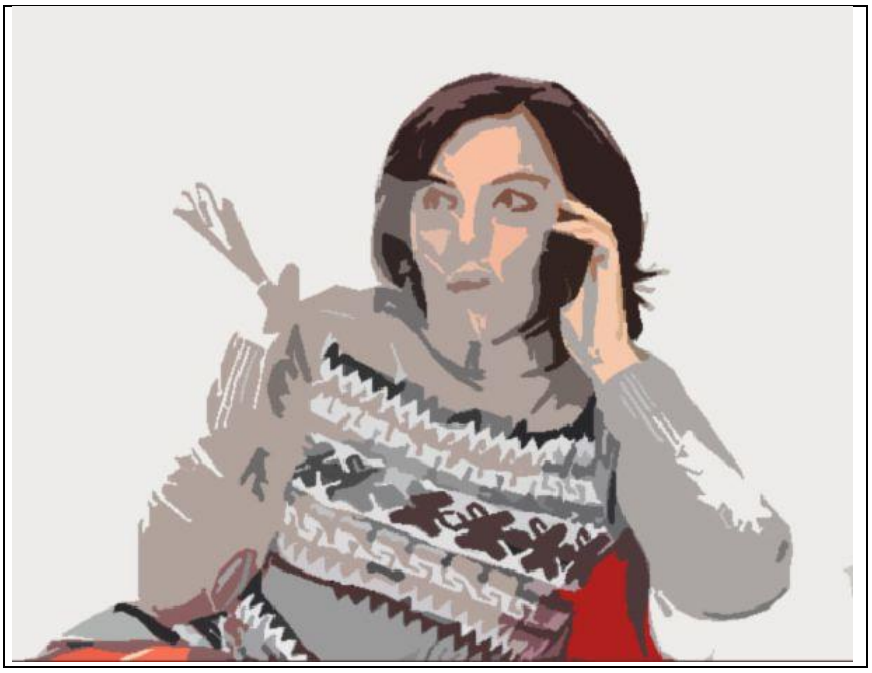

টেলিফোনে একদিন
বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী

-- কথা দিয়েছিলে চিঠি লেখা চলবে, কথা রাখনি।
-- তার জন্যে কষ্ট পেয়েছি।
-- আমি কিন্তু হেসেছি খুব।
-- আমার কষ্টে তুমি হাসলে কেন ?
-- ঠিকানা দাওনি বলে।
-- ঠিকানা ছাড়া কি চিঠি লেখা যায় না?
-- যায়।
-- তবে, লিখলে না কেন ?
-- লিখে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি সব।
-- ছিঁড়ে ফেললে কেন ? যা লেখা হয়েছিল, সে তো আমার।
-- জানি, কিন্তু সাহিত্য হয়নি যে!
-- ও, তোমার তো আবার সাহিত্য হতে হবে।
-- আচ্ছা, তোমাদের সেই পুরোনো ঘরটা আছে ?

-- কোনটা ?

-- ঐ লাল টিনের ঘরটা। যেখানে উদাসী হাওয়ায় জানালার পাশে বসে তুমি চাঁদ ধরতে। চিঠি লিখে শব্দগুলো ছড়িয়ে দিতে জোছনায়।

-- সবই অদলবদল হয়ে গেছে।

-- কার ?

-- আমাদের।

-- তাহলে এখন কি তুমি মাটির গান শোনো না। স্নান কর না জোছনায়। ডাকবাক্সের তালা খুলে উড়তে দেখ না পাখির পালক।

-- আমার তো সেই ফ্ল্যাটবাড়ি। পা বাড়ালেই লিফট। লিফট থেকে গাড়ি, গাড়ি থেকে সোজা অফিস, জানালা বন্ধ, এসি চলছে।

-- বাব্বা, বেশ বড়ো পদে আছ। কাজেকম্মে অহংকারে খুব ব্যস্ত থাক বুঝি ?

-- নিজের মধ্যেই থাকি, বেরুতে পারি না, তবুও মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে তোমাকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করে।

-- আমাকে! দেখতে ইচ্ছে করে তোমার? তখন কী কর তুমি?

-- মোবাইল খুলে নামটা একটু দেখে নেই। অদ্ভুত নাম তো! সব্বাই ভুল করে।

-- তোমারও ?

-- না, আমার ভুল হয় না।

-- হ্যালো, যাঃ, লাইনটাই কেটে গেল।

-- হ্যালো।

-- খুব বৃষ্টি হচ্ছে। নদীটা কেমন হাসছে দেখো।

-- হ্যালো হ্যালো...

-- একটা নৌকো ভাটির টানে সাগরের দিকে এগোচ্ছে।

-- হ্যালো, শুনতে পাচ্ছো...

-- দেখো, কচুরিপানার ফুল কি সুন্দর ময়ূরের পাখা লাগিয়ে উড়ছে। ‘কৃষ্ণকলি তোমায় বলি’ গানটা একটু শোনাবে ?

-- কৃষ্ণকলিকে মনে পড়ে তোমার?

-- পড়বে না মানে?

-- কালো বলে ভীষণ মনখারাপ লাগত। তাই আমি তারাশংকরের কবি পড়তে বলেছিলাম। ‘কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ কেনে’। মনে আছে ?

-- মনে থাকবেনা মানে ? ভালোবাসা কখনো কি হাতবদল হয় নাকি ?

-- এ-কথা তুমি বিশ্বাস করো ?
-- করি। প্রথম প্রেম, না থাক --
-- হ্যালো হ্যালো , যাঃ আবার লাইনটা কেটে গেল।
-- হ্যালো, এখন কিন্তু তোমার কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।
-- হ্যালো, তোমার কথা শুনতে ইচ্ছে করছে খুব।
-- হ্যালো...
-- ওফ্! নেটওয়ার্ক বিজি...
-- হ্যালো। হ্যালো।

HOME

চিরশ্রী দেবনাথের দু'টি কবিতা

কবিতা

কবিতা লেখার আগে
মুছে ফেলি সন্ধ্যার ধুলোর মতো প্রসাধন
কবিতা কেড়ে নিতে থাকে ঠোঁটের রঙ
ধীরে ধীরে নামে শ্বেত ঝড়
তারপর হৃদয় খুলে যায়,
নগ্নতার অপেক্ষায় ভারবাহী কঙ্কাল
প্রেম আসে অক্ষরের অজুহাতে,
যেন ডুবন্ত বাণিজ্যতরী এক বাসন্তী সন্ধ্যায়
এখানেই একটি কবিতা দাঁড়ায় ছায়ার মতন
প্রাণপণে শরীর খুঁজতে থাকে সে

হেমন্তের পাখি

বিবাহের চিঠিরা একটি একটি হেমন্তের পাখি
শীতের বেলায় তারা নাম ও গোত্রের বাহক
গৃহস্থের ঘরে নিয়ে আসে দীর্ঘ জীবনের নিমন্ত্রণ
এ পথে কিছু ভুল লেখা থাকে সোনালি অক্ষরে

সামুদ্রিক সানাই যেন আনমনে ফেলে যায়
নোনা হলুদ এক উদ্ভিদের বীজ,

উচ্ছ্বাসের মেঘ চিঠির পলকে, অকাল শ্রাবণে,
হিম কেটে নিয়ে আসা
একটুখানি যৌথ অরণ্য।

HOME

কবিতা

রূপকথার তীরে

শর্মিষ্ঠা পাল

রাত পেরোলেই নদীটা রুপোলি রঙ ধরে
সব কালো মুছে দিয়ে সূর্যস্নানে
মুখ গুঁজে থাকে বালিশের ফাঁকে দুঃখ স্বপ্নগুলো
তখনো নিজের মত করেই

ভেসে আসে বাঁধভাঙার আওয়াজ ঐদিক থেকেই
নেমে আসে এক এক করে সৈনিকেরা
ঘোড়ার খুরে ধুলোঝড় তুলে
মাঠ ভরে যায় গন্ধে

রুপোর জলে মিশতে থাকে সোনার ধুলো
দুই পাড়ে ঢেউ তোলে ছলাৎ ছল্ !
ভেসে যাওয়া খড়কুটো জাপটে ধরে
জেগে থাকে কিছু পরজীবী-মুহূর্ত
আর সাতরঙের আঁচড় কেটে
ফুটফুটে দিনগুলো -

জল গড়িয়ে পলি জমে প্রতিটি বর্ষা শেষেই
উঠে আসে ডুবে থাকা সম্ভাবনার সবুজ
মেতে ওঠে রৌদ্রস্নানে আবারো।
বাহারি চোখের ঘোড়াগুলো তখনো আসে
দলবেধে ঘাসের সন্ধানে সঙ্গে ঘরমুখো সৈনিক
ভরাট মাঠে ঢেউ লাগে নতুন করে - সবুজে হলুদে
ভেসে বেড়ায় সাদা মেঘে ঘোমটা টেনে
গাংচিলগুলো আছড়ে পড়ে নীরব পেলেই
দিনদুপুরে - সুযোগ বুঝে
শীতল জলে বড় তৃষ্ণা তাদের!

শুধু রাজকন্যার ঘুম নেই -
নিদ্রাহীন আলুথালু চোখ দুটো খুঁজতে থাকে
রুপোর কাঠি সোনার কাঠি।

HOME

কবিতা

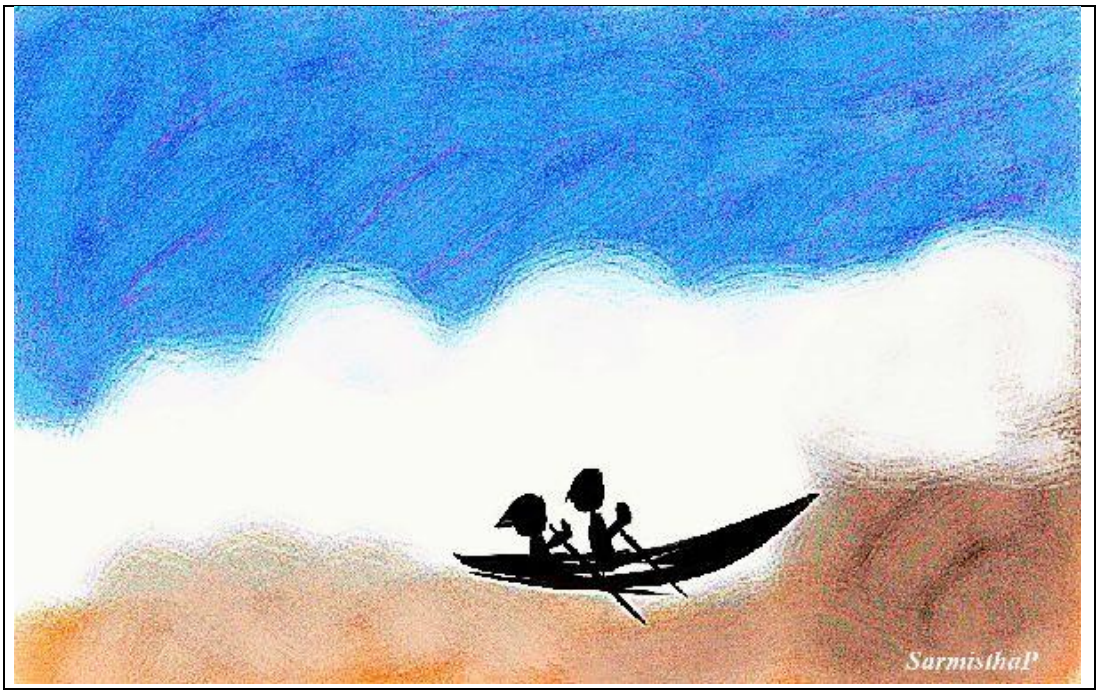

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের দু'টি কবিতা

তোমাকেই

তোমাকেই ভালোবেসেছিল কবি
'শবদে শবদে' বিবাহের কথা
বলেছিল। চুপিচুপি বলেছিল –
'যদিদং হৃদয়ং তব
তদিদং হৃদয়ং মম –'
তুমি কি শুনেছিলে তা ? কখন
যে চিত্রকল্পের মায়ায় জড়িয়ে
গেলে, আর সোনালি চাঁদ
নেমে এসে আমাকে জড়ালো
কামরাঙা গাছের তলায়। বরং
যাকে ঘৃণা কর, তাকেই কবিতার

গূহ্য কথা শোনাও। যাকে
ভালোবাস, তার হাতে তুলে দাও
‘শাহ্‌রিয়ার-এর শ্রেষ্ঠ কবিতা’।
জানালার শার্সিতে দেখো দ্বিতীয়ার চাঁদ।
শেষ রাতে ভুল করে ডেকেছিল এক কালো কাক।

অনুরাগিণী

যে শুকনো ডাল, কালো কাকটি
বসে বৃষ্টির জলে ভিজেছিল।
পরকীয়া-প্রবণ কোকিল বসন্তর
কথা বলছে না এখুনি। এখন কবিরা
সন্ত্রাসের কথা বলছে বৈশাখী মেলায়।

সুন্দরীর দিকে মুখ ফেরালেন না
যে রাগী কবি, তার বয়সের
হিসেব জানে রাধিকা।

সীমানা পেরিয়ে গেলে
তীব্র বেগে চলে যাও
নবীনগরের দিকে, সবুজ
প্রান্তরে অপেক্ষায় আছে
নীলাম্বরী এক নীলাক্ষী।

সে শুকনো ডালে সবুজ
পাতার উল্লাস দেখেছে
কবির অনুরাগিণীরা।

HOME

কবিতা

মাধব বণিকের চারটি কবিতা

হেমন্তে

চাদরমুড়ি দিয়ে বাতাসে উড়ে যাচ্ছে নামহীন পাখি
তার দোলন বাকহীন
নিঃশব্দ পথের দু-পাশে এঁটো হাতে হেমন্তের গাছ
বালির চিকচিক ডানায় কথা ফুরিয়েছে তার।

অন্ধকার এলে ডানায় গা জুড়োবে পাখির চাদর
দেহাতি লালন অমলিন গান ছড়াবে
সুনসান বাতাসের গায়ে।

জীবনসত্য

জীবন যা হোক এঁদোগলি নয়
এসত্য জেনে, পাতারা ভেসে বেড়ায় ফটকে।
কানারোদে জেগে থাকে গোলাপি টান।
তুমি চেনা-অচেনায় হেঁটে বেড়াও
মাটির ঘড়ায় জল রেখে আবারও হাঁটো
এ-গলি সে-গলি পাথুরে নক্ষত্রে এত বিকিরণ
তুমিও ভাসো পাতার মতো গাছের মতো বৃষ্টিতে

আমি সাবালক ভূমি ছেড়ে এইমাত্র উঠে আসি পথে
পথ কিছুই বলে না
ক্ষত দেখিয়ে এগিয়ে দেয় বাণবিদ্ধ অগুনতি মোড়ে
যেখানে ট্রাফিক নেই, সিগন্যাল নেই
আঁকাচিহ্নে আমার ছায়া গেঁথে আছে।

এই জনবিরলে

অজানার ভয়ে ভীরুপথ গাছতলা চেনে

সারসার বিন্দুটানা পথ পাশাপাশি কথা বলে
শ্যাওলাসিদ্ধ এই জনবিরলে কদাচিৎ কেউ হাঁটে
তারা ফিরেও আসে
আমি তাদের দেখি তাদের শুনি আর মুগ্ধ হই

ঘরের সবকিছু আমার চেনা, দিন-রাত অবসরের সঙ্গী।
অজানায় চলে যাওয়া মেয়েটির ছবি ফিরে আসে একদিন
পাড়াসুদ্ধ নির্ঘুম রাত থমকে যায় অচেনায়
অন্ধকারে জ্বলে ওঠে অগুনতি মুখ, বাক্সভর্তি পাষাণহৃদয়

চেনা নিক্কণ

চলো হাতে তুলে রাখি কিছু সময়
নীরবতার ভেতর অসংখ্য প্লাবনঘাট ডেকে নেয় ওপারে
হৃদ্য কিছু যাপনও হয়তো জমা হয় ফেরিঘাটে
বৈঠা হাতে তুমি গুণগুণ কর জলের গান
মাছেরা দলবেঁধে ফিরে যায় স্রোতের অন্তরে

মাঠের ভেতরে সব, বাইরে এলে সারশূন্য চারদিক
কবচকুণ্ডল পরে যত তাপ নিতে পার হৃদয়ে
তাই গ্রাহ্য হবে, অম্লান ফেরি হবে বনবিজনে।

অশান্ত কিছু পল ছেড়ে দাও বাতাসে বাতাসে
তারা হাওয়া খাবে ভোরের নির্জন ঘাটে
নীরবতার পায়ে পায়ে খুঁজে পাবে চেনা নিক্কণ।

HOME

কবিতা

দিলীপ দাসের কবিতা

বাদামের খোসার মতো

১
এভাবেই আমরা ফুরোই ?
বাদারে খোসার মতো পড়ে থাকি অনাদৃত ঘাসে;
বৃষ্টি হলে জল জমে,
রোদ রোজ শুকোয় তাকে ?

রোদ-বৃষ্টির মাঝে
জমে থাকে কত ফুল্লকুসুম
আরও কত কত দীর্ঘ হতাশ্বাস
সেসব নিয়ে দিব্যি উড়ে যায়

সকাল-সন্ধ্যা-রাতের বাতাস।

২
যারা আমাকে দেখেছ
তারা রবীন্দ্রনাথকে দেখনি।

রবীন্দ্রনাথের পর জীবন
এখনও সময়ের পোল পেরোয়নি।
জলের কলকল শব্দ শুনে
আমি ভাবি
সবাই কেন চলে যাচ্ছে জোছনার বনে,
আমার জন্যে রেখে
অমাবস্যার রিক্ত হাতছানি ?

ওহে, জীবন কি তবে
এখনও ফুরোয়নি ?

HOME

কবিতা

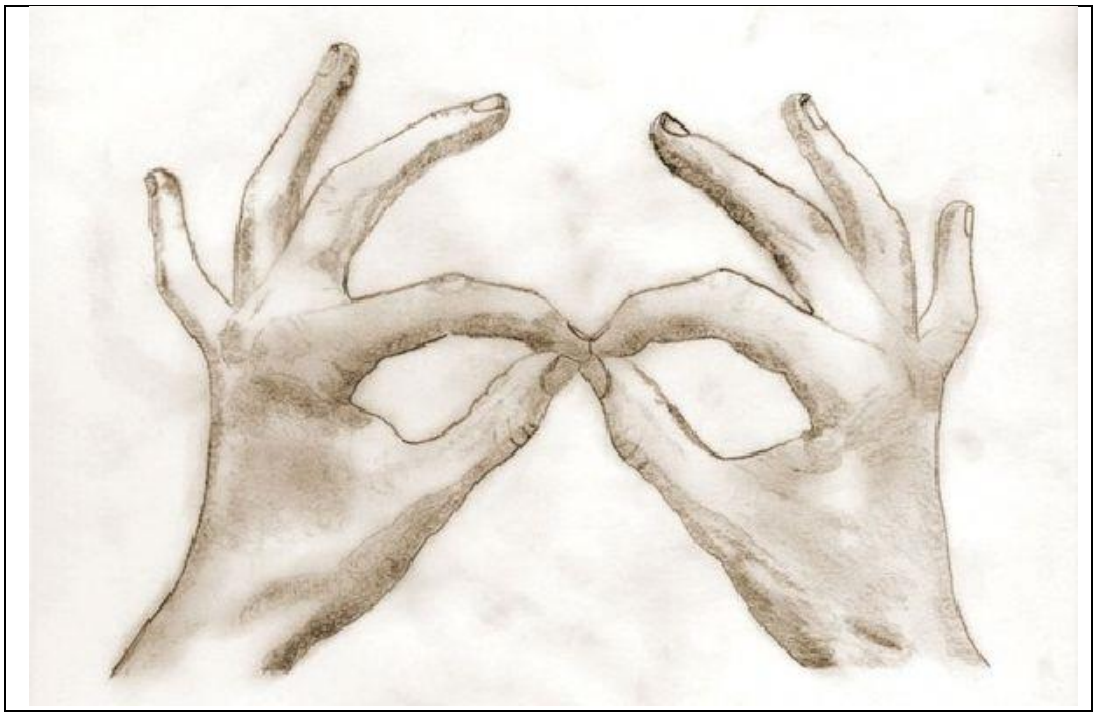

কাকলি গঙ্গোপাধ্যায়ের দু'টি কবিতা

অভিমানী

যাব বললেই যাওয়া হয় না
দিনের পায়েও বার বার জড়ায় গোধূলি-ব্যথা
রাঙা হয়ে ওঠে পথঘাট। এ বেদনা-আলোয়
নিজেকেও অচেনা লাগে, তোমাকেও।
অভিমানী পাখিরা আর উড়বে না এখন
ডানার পালকে সব আলো মুছে ঘরে ফিরে যাবে
রোদের গন্ধ যারা কিছু রাখল ধরে
তারাও বোঝেনি, যেতে যেতে দিন কী ব্যথা ছড়াল
রাতের অন্ধ-বুকে শুধু তার স্পর্শ লেগে থাকে।

শর্ত মেনে

উড়ে যাওয়ার শুধু ছন্দই নয়, শর্ত থাকে
ফিরে আসার।
একই রেখা আঁকে রোজ সন্ধ্যার পাখিরা
দিগ্‌বলয়ে, চেয়ে থাকা চোখে, উড়ে যেতে যেতে –
ঘরে ফিরছে ওরা। ওদের ডানায় ফেরার ছন্দ
ওড়ার ছন্দে মিশেছে অস্থির মগ্নতা
ঠিকানা ছোঁয়ার।
ওদের পিছু ঘুরে ঘুরে, শূন্যের পাকে পাকে শূন্যতা নিয়ে –
ছাপোষা চোখও এল ফিরে,
দৈনন্দিন জানালার খোপে
ফিরে আসার শর্ত মেনেই, আরও একবার।

HOME

কবিতা

কল্যাণব্রত চক্রবর্তীর দু'টি কবিতা

সবাই একক যাত্রী

বহুদিন এইভাবে যায়, ধান কেটে নিয়ে গেছে
রাশি রাশি খড় কেউ ফেলে গেছে মাঠে,
কেউ নেই তারপর, সুদীপ মৃণালকান্তি,
হেমন্তের বেলাশেষে হিসেবি
মানুষজন সুবাতাস তুলে নিয়ে গেছে।

হোক না আপন কেউ সেও যাবে
সবাই একক যাত্রী অস্থায়ী শিবিরে
মাল্পত্র কিছু নেই, ফ্ল্যাক্স বা
টিফিন কৌটো কিছু নয়

পাহাড় পেরিয়ে গেলে অবিশ্রাম
জলাধার, নির্জনতা, থেমে থেমে
কেউ যেন ডাকছে আমাকে।

যেভাবে সবকিছু

কে কাকে ল্যাং দেবে, ব্যস্ততার মধ্যেই দেখি একজন
অবরোধ ঠেলে মাইকের কাছে চলে গেছে;

সারাৎসার কিছু না থাকলে পিঁপড়েরাও
হাসাহাসি করে, সব কিছুতেই সবার অধিকার,
ডোভারলেনে জমির দালাল ঢুকেছে,
প্রমোটারের লোকজন গায়কি নিয়ে লিখছেন

শহরে এই বাড়িতে কবি এসে থেকেছেন দু-বার
হেলাফেলা করে ফেলে দিও না বাছা, ছবির
ওপারে দেখ মেঘ জমেছে, ভেঙে পড়ছে মালঞ্চ
দোতলায় একটাই খোলা জানালা
এখন আর আকাশ দেখা যায় না।

কতকিছু হয়, আরও হবে, নিচের দিকে তাকালে
মাথা ঘুরে যায়, তবু তুমি আসবেই ইচ্ছে হোক
না হোক, আমি চলে গেলে ঘর খালি রেখে
রাস্তায় বাসস্টপে গিয়ে দাঁড়াবে।

HOME

কবিতা

বনানী ভট্টাচার্যের দু'টি কবিতা

একাকী

সন্ধ্যার আহ্বান
এক রুপালি চাদরে
খোলা মাঠে, সবুজ ঘাসের আদরে
চাঁদটাকে ছুঁলাম দুহাত বাড়িয়ে...

দিতে পারো আমার পরিচয় ?

আজ তবে ভালোবাসবো একাকী,

তুমিও স্বীকার ক’রো একদিন
রেখে যেও তমসুক
শুধুই মোহ নয়
আমিই তোমার প্রথম, আমিই শেষ
ভালোবাসা.....

অযাচিত

স্বপ্ন খুঁজেছিল মেয়েটি ওই ছেলেটির দুই চোখে
জানতোনা রূপকথা হারিয়ে যেতে পারে
গল্পের শুরুতেই
নতুন ক’রে একটা পথ আলোকিত করতে
কেটে যাবে এতটা সময়
নিভে যাবে অনেক মোমবাতি
নাগরিক কোলাহল আর অযাচিত হৃদয়ের উত্তাপে
ফুরিয়ে যাবে শেষ অশ্রুবিন্দুটিও
সবাই কি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে জানে !!!!

HOME

কবিতা

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

চিত্রলিপি

পায়ের কাছে পড়ে আছে পাকা পেয়ারা
মেয়েটির স্তন লজ্জা পাচ্ছে
আর বৃষ্টি ততোই ফুটিয়ে তুলছে

২.
পানপাতা নিয়ে কথা হচ্ছে বৃদ্ধা ও কুমারীর
বাথরুমের আয়না নগ্ন হলে
তারা দুজনেই হেসে ওঠে
ফোয়ারা উপভোগ করে

৩.
জোছনায় লাউলতা কখন নারী
নাচের মুদ্রায়
সুরাপাত্র এগিয়ে সে ডাকে

মেহেবুবা
আজ তবে মেহেফিল হোক

৪.
ফুলের উপরে স্বাভাবিক প্রজাপতি
ছাত্র দেখাচ্ছে দিদিমণিকে
তবুও গালে রঙ লাগে
নেমে যায় চোখ
প্রজাপতি ও ছাত্র কারণ বোঝে না

শীতরচনা ১

কখন ডিসেম্বর হয়ে পড়ি
কুয়াশা ডেকে নেয়
কফির কাপের পাশে
খোলা পড়ে থাকে লেখা
নতুন শব্দের অভাবে

বেশ আদ্রর্তাহীন
গাছেরা পাতা ঝরিয়ে
অপেক্ষায় ক্রিসমাস ট্রি হবে
পরিযায়ী ডানায়
এক পেরেক বিদ্ধ ঈশ্বর
বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে যায়
অন্তর্বাস আর জন্মনিরোধক পিলের

খোলস ছেড়ে গেছে যে
সে শীতঘুমে
অনিবার্য তার এই যাওয়া
তবুও খেজুর গাছের কাছে
গুড়ের গন্ধ
বড়দিনের কেককে টেক্কা দিয়ে
গরম চাদর
আর একটু আদর

কিন্তু তুমি হারালে বাকি সব
নিতান্তই শব

জানুয়ারী এক নয়া জীবন চাহিদায়

২.
শীত রচনা ২

সকাল হারমোনিয়াম হলে
একটু রোদ পোহাই
কাগজের অক্ষরের থেকে সরে
রিডে কান ফেলি
কার্নিশে পাখিদের ভীড়
ডানাকাটা পরি চলে গেলে
সুনসান মাঠ
চোখকে জ্বালাতন করে
তবলার বোলে নি কিছুটা আরাম

হাওয়ায় হাওয়ায় শীত
তুমি জড়িয়ে ওম
রান্নাঘর মটরশুঁটি বেছে রাখে

মাংসের নতুন রেসিপি
প্রস্তুত
কখনো অপ্রস্তুত করে
টেবিল ম্যানার্স ভুলে
জিভের দাঁতে তুলে নি
সেই পুরনো প্রেম পর্যায়

৩.
শীত রচনা

৩.
দুজনে

শীতের ঘর হয়ে আছি
কাটা টমেটো
ছুরি
গোয়েন্দা সিরিয়াল
কেউ মটরশুঁটির কথা বলছে না
জামা খুলছি

৪.
মেথিশাক

তিক্ততার মধ্যে রেখো না
মোলায়েম লেখো
সাদা ভাতের উপর
শীতকাল
ধনেপাতাও
সুবাসিত

৫.

চড়ুইভাতি

কিশোর দেখছে কিশোরীকে
উথলে উঠছে মাংস
নদী
পায়ের পাতার শব্দ
ডানার অস্থিরতা

নীরব সূর্য নেমে এলে
চোখ নিয়ে বাড়ি ফেরা
কেউ কিছু কি হারালো !

৬.

শীতরচনা ৭

মেঘ থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না
পাথর পাথর নয়
আমাদের নরম অভ্যাসগুলি
বাউল

উলের সময় এসে গেলে কাঁটা
সমস্ত যন্ত্রণা উপড়ে গলায় গলায়
হাতে হাতে ভাব
সরোদে

নৌকা চলে যাওয়া পর বাতাসের
ভিতর শরীরে কান্না
নদী জানে
আমরা শুধু চড়ুইভাতির শেষে
ফেলে আসি এঁটো থার্মোকল
আর কিছু হাড়গোড়
ভবিষ্যতের জিম্মায়

HOME

ইন্দ্রনীল সেনগুপ্তের কবিতা

ছায়ায় সঙ্গে তাকে

তাকে রেখেছি ছায়ায় আন্তরিক হাহাকারে;
সে বড় নির্মম ছিলো,
কোন অভিযোগ ছোঁয়নি,
কিছু একটা হোক বলে সে ঝাঁপায়নি
কখনও অন্ধকারে।
ভাঙ্গেনি আয়না কোনো অথবা ফুলের টব,
সেন্টার টেবিলের কাচ,
অথবা ঐরকম কিছু
স্থিতধী ভঙ্গুর।

রেখেছি অভ্যন্তরে তাকে,
সেকি বাইরে যাবে,
আমাকে চূর্ণ করে,
যেখানে হাজার নক্ষত্র পুড়ে যায়
চাঁদ জ্বলে যায়- সেখানে ?

বিনিদ্রতার কোন নাম হয় না মোহময়,
তবুও সেখানে সে থাকে ছায়ার সাথে।

HOME

কবিতা

নীপবীথি ভৌমিকের দু'টি কবিতা

শেষ বসন্ত

উৎসব শেষ, চলে গেছে সব বসন্তের অতিথি

যারা এসেছিলো, কিংবা যারা আসার অধিক গিয়েছে থেকে গভীরে...
আসা আর যাওয়া,কতই না দাগ রেখে যায়
চিহ্ন শ্লোকের দেহে রেখে যায় কতো নির্বাক যন্ত্রণা,
সে আর কে বোঝে বলো ?

হয়তো জানে,বা বোঝে,কিংবা বোঝার অধিক না বুঝেই
যায় চলে অন্য কোনো সূর্যাস্তের দেশে!

আসলে ধুলোয় যার জন্ম, ধুলোর পথেই তো তার মৃত্যু
সময় শুধু বয়ে যায়, যায় বয়ে, মুহূর্তের হাতে
নীরব স্পর্শ বন্ধন সাজিয়ে।

ভাঙন

কিছু ভাঙলো বোধহয়, ভাঙুক!
খুলে দাও বরং ওই পশ্চিমের জানলাকে
আসুক কিছু আলোকশ্লোক, আর কিছু মথ
কিংবা প্রজাপতির রঙিন দেশ,
ভাঙন সুরে সুর মিলিয়ে
বাজুক আবার যজ্ঞ-সানাই
শোনোনি তুমি মধুমন্তীর সুরশ্লোক স্বর!
কোথাও কোনো এক মিলন যজ্ঞমঞ্চ ...
দূর থেকে আসে, দ্যাখো ওই হলুদ সান্ধ্য আলোক মালা

---ভাঙুক, আরো ভাঙুক ...
শব্দের পথে নিঃশব্দ উন্মোচনে মুক্ত হয়ে
আসবে মেঘজল, আসবে অনন্ত উৎসব...
আসলে জানোতো, সব ভাঙনেই বিচ্ছেদ সুর বাজেনা কখনো কখনও
কিছু ভাঙন যে আসে দীর্ঘ শীত ঋতুর পথে
আবার বসন্ত ঋতু রঙ মাখবে বলে।

HOME

কবিতা

তুষ্টি ভট্টাচার্যের দু'টি কবিতা

মাথুর

প্রাপ্তির গাছে ফুল ফুটেছে
সাদা ফুল, কালো ফুল
দাতব্যচিকিৎসালয় জুড়ে ফুল আর ফুল

ফুলে ফুলে ঢেকে যাচ্ছে সমাধি

ফুলে মধু আছে, যেমন ভ্রমরও থাকে মধু মেখে
আর গুনগুন খুনে ভরে যায়
অর্দ্ধেক রাধা ব্যথা বোনে খুব
আর ব্যথা ঝরে যায়।

অর্দ্ধেক রাইয়ের ফুলে
মাথুর মাথুর
শ্রাবণ ভরা গান
বেজে যায়, বেজে যায়।

গোটানো তাঁবু

তাঁবু গুটিয়ে নেওয়া বইমেলার কাছে যাব
যেখানে ইতিউতি ছেঁড়া কাগজের ভাঁজ
যেখানে কবির স্বাক্ষর নেই –
গুটিয়ে নেওয়া তাঁবুর মত কিছু অক্ষর
ছাপাখানা থেকে তখন অনেক দূরে চলে গেছে।
খোলা মাঠ জুড়ে গর্তর জেগে থাকা দেখে
বকখালির কথা মনে হয়
লাল কাঁকড়ার চলন মনে পড়ে –
ভর্তি হতে আসা বালি সমুদ্রের গল্প জানে না
নদীকে দেখে নি এখনও
গুটিয়ে রাখা তাঁবুর ভেতরে তখনও মানুষের স্রোতের ছায়া
উড়ন্ত ধুলোকণা যে স্রোতে পথ হারিয়েছিল ক'দিন আগেই।

HOME

কবিতা

অঞ্জন বর্মনের কবিতা

উদ্ভিন্ন

পুরোহিত পাড়ার মেয়েটা যেদিন জামালের সঙ্গে পালালো
আমি প্রথম সত্যিকারের তরোয়াল দেখলাম
চতুর্দশীর রাতে পাড়া জুড়ে অসংখ্য চকচকে তরোয়ালের মাঝে
নিজেকে সিরাজ মনে হচ্ছিল...

কালীপূজোর পরদিন ভোরে দেখলাম সত্যিকারের লাশ
মা বলল – ‘‘বাগদি পাড়ার মেয়েটা মুখ পুড়িয়েছে’’
তার ঠেলে আসা চোখে, যন্ত্রণাকাতর ঠাণ্ডা মুখে
আমি কোনও পোড়া দাগ দেখিনি...

ইটভাটায় খেলতে গিয়ে দেখলাম -

দুটো শরীর ছটফট করতে করতে মিশে গেল
ভয়ঙ্কর দৌড়ে সেই যে খিড়কির পাড়ে গিয়ে বসলাম
রাতে বাবা আমার ঘুমন্ত শরীর ঘরে নিয়ে যায়...

ঘুড়িটা রোজ অল্প বেড়ে গোঁত্তা খাইয়ে
শান্তাদের ছাদে ফেলি। বলি – "ধরতাই দে"
ও রেগে বলল – "তোর মাকে বলে দেব"
এখন শুধু চিলেকোঠার ঘর থেকে ওদের ছাদ দেখি...

মাধ্যমিকের ঠিক আগের দিন গুরু'দা খুন হল
দুটো ছেলে বাইক থেকে নেমে ভরা বাজারে
ওর খুলি উড়িয়ে দিল। আমার চোখ একটুও কাঁপেনি
তিনটে লেটার নিয়ে পাশ করে আমি বড় হয়ে গেলাম...

HOME

তৈমুর খানের কবিতা

আমাদের ভেতরে ঘর

দুয়ার নেই, দুয়ার নেই
বাইরে বাউল চেঁচিয়ে কাঁদে
আমাদের ভেতরে ঘর
সারাদিন কোলাহল
থালাবাটি বেজে ওঠে
ধুলো ওড়ে, প্রবল জ্বর।
তৃষ্ণাকাতর ঘুমহীন রাত

সেদ্ধ হয় মোহের ভাত,
জল গড়ায় প্রবল স্রোত
স্রোতে ভাসে আবেগমাছ।
হলুদ কিরণ আসছে যাচ্ছে
দেহ খুলছে বাসন্তী গাছ,
বেজে উঠছে রমণ বাঁশি
সুর কুড়োচ্ছে ভ্রমের হাসি।
বাইরে জাগ্রত দিন
দিনের কমল রাশি রাশি
ফুটে উঠছে উদাসীন।
ভেতরে ভেতরে সিংহ
অরণ্য, অরণ্যময় —
গর্জন, গর্জন শুধু —
তিরবিদ্ধ চেতনায়।
হাহাকার শুয়ে থাকে
প্রেমের শয্যায় মরা চাঁদ
ধুলোময় আকাঙ্ক্ষার
উদ্ভিন্ন নষ্ট সংঘাত।
রক্তাক্ত বিলাস এঁকে
আসে কার প্রেতছায়া ?
নিজেই নিজের জাদুকর
সঞ্চারিত হতে থাকে মায়া।

HOME

দেবীস্মিতা দেবের দু’টি ছড়া

কাকতাড়ুয়া

প্রায় ছেঁড়া এক পাঞ্জাবী আর
পুরনো পায়জামা
বাঁশের গায়ে জড়িয়ে দিলেন
ফসলপ্রেমী মামা।
বাঁশের ডগায় আটকে দিলেন
মুখ আঁকা এক পাতিল
আজ থেকে তাই ক্ষেতের ভেতর
পক্ষী ঢোকা বাতিল।
শীত, বৃষ্টি, রোদ, ঝড়েতে
কাকতাড়ুয়া ঠায়

দাঁড়িয়ে থেকে মগ্ন থাকে
কঠোর পাহারায়।
কাকতাড়ুয়া কাক শুধু নয়
তাড়ায় সকল পাখি
অঘুমা এই ফুলিশটাকে
যায়না দেওয়া ফাঁকি।
কিচির মিচির শুনিনা আর
শুনশান পুরো মাঠ
মন থাকে না ভাল যে তাই
ফেলে রেখে পাঠ।
কাকতাড়ুয়া তাড়িয়ে বলি
লাগ ভেলকি লাগ
লাঠি নিয়ে আসছে মামা
পালাই পালাই ভাগ।

বকমামা

বকমামা বকমামা
এক ঠ্যাং তুলে
চলে এলে মাছ নিতে
কি জানি কি ভুলে।

তুমি কি গো মুনি ঋষি,
খালি কর ধ্যান?
চারিদিকে কি কি চলে
থাকে না যে জ্ঞান।

মামা তুমি মাছ নিতে
দাঁড়াও তো ঠায়,

মাছরাঙা মাছ নিলে
কর হায় হায়।

বলিহারি মামা তুমি
কী যে কর রোজ?
মাছ খায় অন্যরা
তুমি কর খোঁজ।

HOME

শংকর দেবনাথের দু'টি ছড়া

ইচ্ছে করে

ইচ্ছে করে পাখির ডানায় মনটাকে দিই জুড়ে –
মুক্তি সুখে বুকটি ভরে বেড়াই ঘুরে ঘুরে।
সূয্যি হাসে সকাল আসে ফুলের রঙিন নিয়ে –
ইচ্ছে করে একটু দাঁড়াই ওদের পাশে গিয়ে।

পড়ায় পড়ায় গড়ায় বেলা যায়না দেওয়া ফাঁকি –
বইয়ের পাতার যাঁতায় কেবল পিষ্ট হতে থাকি।

ইস্কুলেতে যাবার আগে ইচ্ছে – ঝাঁপাই জলে –
ভাল্লাগে না করতে সিনান বাথরুমের ওই কলে।

মনটা তো চায় বিকেলবেলায় কাটাই খেলার মাঠে –
হয়না সে আর – আসেন টিচার, সূয্যিটা যায় পাটে।
ইচ্ছে জাগে যাই ঘুমিয়ে – স্বপ্নপুরী ভেসে –
কিন্তু আসে পরীক্ষা-ভূত ভয়াল বিকট বেশে।

ইচ্ছেগুলো কাঁদছে ধুলোয় – আসছে তেড়ে ভীতি-
নষ্ট সুখের কষ্ট বয়ে মরছি ধুঁকে নিতি।

ইচ্ছে আমার

ইচ্ছে আমার ছড়ার খামার
বানাই বুকের ক্ষেতে –
চাষির হাসির আনন্দে রই
ফলন সুখে মেতে।

সেই খামারের সবুজ গাছে
ফুটবে ছড়ার ফুল –
জুটবে এসে মুগ্ধ হেসে
রঙিন অলিকুল।

চাঁদের প্রাণের আদর মেখে
ঘ্রাণের চাদর গায়ে –
ফুলপরীরা খেলবে এসে
নুপুর পরা পায়ে।

ছড়ার গাছের শাখায় শাখায়
বসবে পাখির মেলা –

সুজন সখার কূজন শুনে
কাটবে সারাবেলা।

শিশুর হাসির বাজবে বাঁশি –
কী সুর মাখা ভাষা।
স্বপ্ন এসে বসবে ঘেঁষে
বাঁধবে ডালে বাসা।

ইচ্ছে আমার ছড়ার খামার
বানাই মনের মত –
ছন্দে গন্ধে ’নন্দে ফলাই
ফসল অবিরত।

HOME

শ্রীয়া ঘোষ সেনের দু'টি ছড়া

মনের মাঝে

তার চোখের মাঝে
ডুবেছিলাম, কখন যেন
অজান্তে,
তারই ছবি বাঁধলো বাসা
মনের মাঝে
একান্তে।
একা হতে মন চায় তাই,
ভিড়ের মাঝে পালিয়ে
বেড়াই –
নিভৃত কোন্ হাতছানিতে

বার্তা আনে দিগন্তের।
তারই ছবি, তারই কথা
আজও আছে
মনের মাঝে
একান্তে।

মায়ের সাধ

মনের মাঝে ইচ্ছে হয়ে
ঘুমিয়ে ছিলি,
চোখের কোণে কাজল হয়ে
জড়িয়ে ছিলি।
উপস্থিতির প্রথম চিঠি
গর্ভে যেন পুণ্যতিথি!
স্বর্গীয় এক অমৃতস্বাদ,
রোমাঞ্চেরি জলপ্রপাত।
উন্মাদনায় আত্মহারা,
উপলব্ধির প্লাবনধারা।
মাতৃত্বের প্রথম গানে,
ভরল জীবন কলতানে।
আমার এই বুকের মাঝে,
রাখব তোকে ফুলের সাজে।
অনুভূতির সাক্ষী হয়ে,
কল্পনাতে থাকিস ছুঁয়ে।

HOME

কবিতা

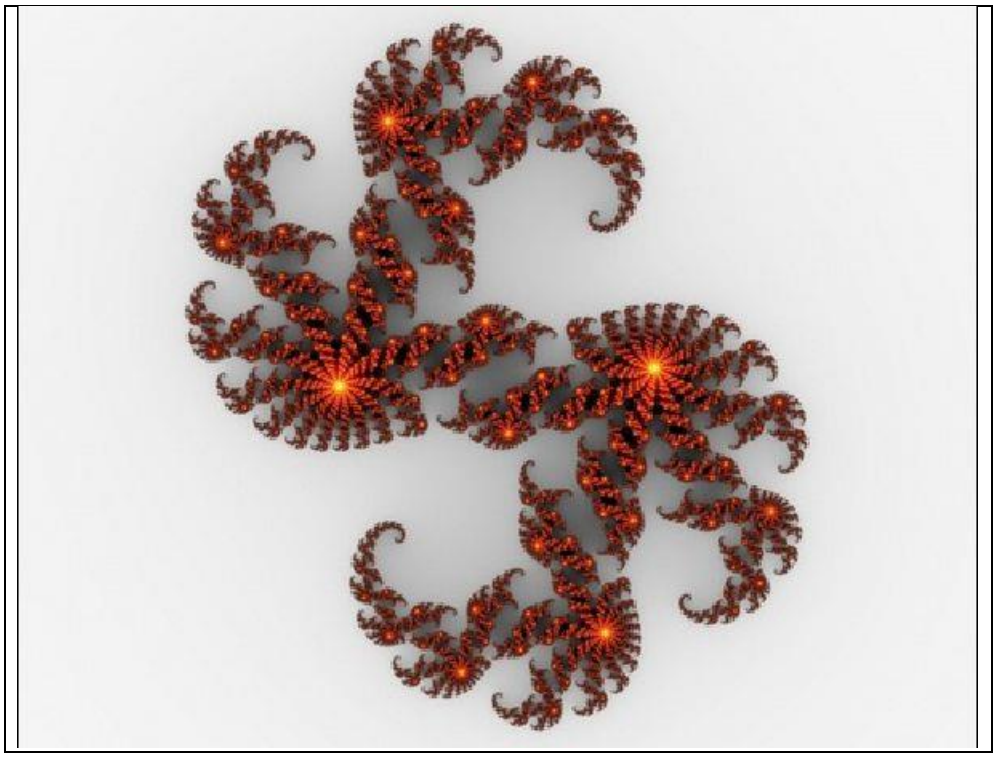

ইন্দ্রজিৎ দত্তের কবিতা

হুই শাম উনকি খয়াল আ গয়া

নদী থেকে সুর কুড়িয়ে নিচ্ছি মেয়েলি জল

তুমি ছিলে না তাই অ্যাতো
নৌকা ফিরিয়ে মৌলালি যুবকেন্দ্র

যা সব ছুঁয়ে নেওয়া তবুও পার্সোনাল মঙ্গলবার
তারিফে তারিফে চোখের ডাক্তারের ঠেক
আর তুমি চশমাতেও নেই

এক টুকরো মেঘে থেমে আছে পাখি

সামান্য জলাশয়
ভেবে ভেবে এই যে তুমি না-ডানা আর
চাঁদ নেই পলকে পলকে খুব ভালো হয়ে আসা ভোর
এলো কি আহিরীটোলায়

বাঁক ছিলো এটা ভেবেই ফিরে গ্যালো ট্রেন
যুবতী রাতের প্যারাডিম
বা

হয়েছিলো বলেই কি হাওড়া ব্রীজ অ্যাতোটা দূরারোগ্য

ছুঁয়েছি
তাই কি একাকার এমন
ইয়ে দিল্ ইয়ে ট্রিগোনোমেট্রি

HOME

কবিতা

নীতা বিশ্বাসের কবিতা

লাশকথা

১

ঘুমোতে না জানা রাতের সাথে
অনেকদিনের সহবাস চলছে
তার মধ্যেই শিখে নেওয়া
দিনপণার রেকাবি
চোয়াল নাড়ানো অভ্যাসের তারানা
লিপিবিহীন দিন

লিউকোমিয়ানো রাত্রির নিচে
শ্বেত অক্ষর পড়ে আছে
ঝরা পালকে একটা একটা করে
দিনাবসানের স্যিলুয়েট
ফাঁকা জামবাটিতে সাঁতরায় স্বপ্নের
লাশকথা
অনিষিক্ত বীজের কান্না...

আরো একটা খোঁড়া পা ফেলে পৃথিবী
এভাবেই...

২
মেয়েটা বিন্দু বিন্দু স্বপ্ন জমিয়েছে
সিন্ধু কামনায়...

সাইকেলের চাকার অনুপুঙ্খে
রাস্তা চলে হাই স্পীডে
x=y এর সমীকরণের রাস্তাটায়
অনেক সময়ই ফণিমনসার বেড়ার নিবিড়
ফুল ফুটলেই চাঁদ ওঠার মিথে
কদমতলায় কে থাকে
জানা কি যায়!

৩
যে তারাটা খসে পড়লো
তার পান্ডুলিপিতে কিছু অচেনা কর্কশ
থাবা বসিয়েছিলো!

বুঝতে পারিনা, মুহূর্তগুলো
সময়ের না কি ঘটনার আত্মজ!
যে তারামাটি গর্ভে প্রাণ
শুনতে পেয়েছে তার
চরণে চলনে কিসের অপার এসে
আলো ফেলে!

অন্ধকারে আলো এসেছিলো

আলো এখন অন্ধকারের
আলো
অন্ধকারের...

কবিতা

উৎস রায় চৌধুরীর দু’টি কবিতা

বিসংবাদ

যে হাতে রন্ধ্র খুঁজে আলাপ
তার নির্যাস ধরে রাখি
পাখনা উদাস হও মাঝি
আমি যাপন দুখে থাকি

আমি রেখাপাত হাসি
নাচে পতন আর বিলাপ
খুশবন্তের মতো ঘুম আসে
বাহার শুয়ে মোচড় খেলা করে
পাষন্ডের বেড়াজালে

কিন্তু

কোনো এক ভ্রম লেগে থাকে সাদা
অস্পষ্ট প্রেমের মতো সারা শরীর এক
ভুলে ভুলে এক হয় নর্মদা জীবন
পাখালি চরে পড়ে থাকে সুখ
তুমি জানতে চেয়ো না মেয়ে

রাধা শব্দটির ঘ্রাণ নিয়ে বসে
একাই কালো জলের দিকে তাকাই
নিজের অন্য মুখ ভেসে ওঠে আজ
সুরে নেমে আসে শুকনো চর, বাতাস
মাখতে মাখাতে শেষ হয়ে যায়
আমার এক যুগ, এক জীবন

HOME

কবিতা

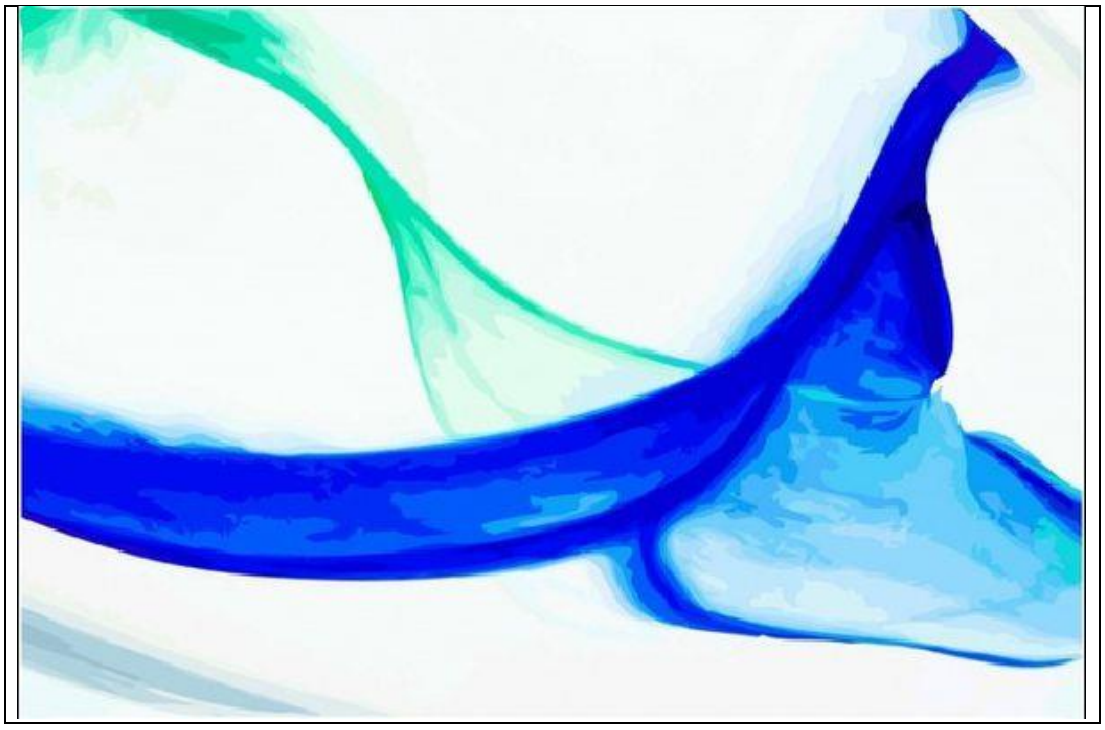

দিশারী মুখোপাধ্যায়ের দু’টি কবিতা

দৃষ্টিভ্রম

যতটা বড় বলে মনে হচ্ছে
আদপে ততটা নয়
ভালো করে স্পর্শ করে দেখুন
কসেরুকার মাঝে মাঝে
অনেকটা করে ফাঁকা জায়গা আছে

যতটা সুনীল বলে মনে হচ্ছে
ঠিক ততটা নয়
কাছে এলে দেখা যাবে
যন্ত্রণার নীল ছোপ কারুকার্য হয়ে ফুটে আছে

বিষপান

পৃথিবীর সমস্ত জলাশয়ে
আজ পর্যন্ত যত ছিল পদ্মের কুঁড়ি
সবাইকে নিজ হাতে শিখিয়েছি পাপড়ি মেলা
জলের উপর তারা চিৎ হয়ে দেখিয়েছে
তৃষ্ণার বৃত্তাকার নির্দিষ্ট বিনয়

কিন্তু যা খুঁজেছি পাইনি সেখানে

পৃথিবীর সমস্ত মরুভূমি
লেহন করতে করতে ভিজিয়েছি ওম
শুষ্কতাকে সরগমের সঙ্গমস্থ করে
উচ্চারণকে ভেঙে ভেঙে বীজপত্র মেলে দেখিয়েছি

মন্দিরে মসজিদে গিয়ে
পাতি পাতি ছড়িয়েছি চোখ
সহজেই পাওয়া গেছে
অনেক অমৃত আর অনেক গরল

কিন্তু যা খুঁজেছি পাইনি কোথাও

সমস্ত শরীরে বইছি নর্দমার দেহ

HOME

কবিতা

শুভেশ চৌধুরীর কবিতা

ভাবনা-১

সকাল হতেই অনেকগুলি কাজে পরপর যুক্ত হয়ে থাকা
এই কাজ করে থাকা বলে নিজেকে ভালবাসি
কাজ না থাকলে বাঁচতে পারবোনা
অনেক দিন আকাশ দেখে স্বপন বপন করি
এই জন্ম শুধু একের জন্য না বুঝতে পেরেছে

ভাবনা-২

যারা গিয়ে থাকে তারা ফিরেই আসে
স্মরিত বা দেহে
তবু তোমাকে চাই দেহ সঙ্গ
দিয়ে

একা যখন এক আকাশ তুমি
একা থাকা আর চাইনি

ভাবনা-৩

চাষ বাস যাঁরা জানেন না তাঁর জন্য কী কিছু করা যাবে
ভাবছি
ভবিষ্যৎ
আমাদের সন্তান
কাদাজলে ত্বক ভিজাইতে দিও
চাষ বাস শিখবেন

HOME

সমিত ভৌমিকের দু'টি কবিতা

স্মৃতি

পাহাড় গড়িয়ে নেমে আসে জল
তারপর ময়ূর নাচ
সবুজ ফসল
অবেলায় ডুব দেওয়া কচিকাচা

আর ঝোপের আড়ালে বসা কপোত-কপোতী।

স্মৃতি মিশে যায় সাগরে ...

পাথর ঠোকাঠুকি খেলা
আর নামহীন খরগোশের অকালমৃত্যু...

এইসব নিয়ে বুনে তোলে যাপন গাঁথা
সবার পুরোনো অনেক কালের দাদামশাই।

খেলা

এখন জেগে আছি আমি, সাথে রাতের আকাশ
মেঘে ঢাকা চাঁদের রং
আবছা ও ধূসর।

চারপাশের অন্ধকারে জ্বলে ওঠে
চেনা-অচেনা পশুপাখির চোখ।

আবার,
নিভে যায় কখনো সখনো, আপন খেয়ালে।

মাঝরাতে আমি, কালো আকাশ, পশুদের চোখ, একফালি চাঁদ

সবাই মিলেমিশে এভাবেই খেলি
লুকোচুরি আর কাবাডি...

HOME

আশুতোষ রানার কবিতা

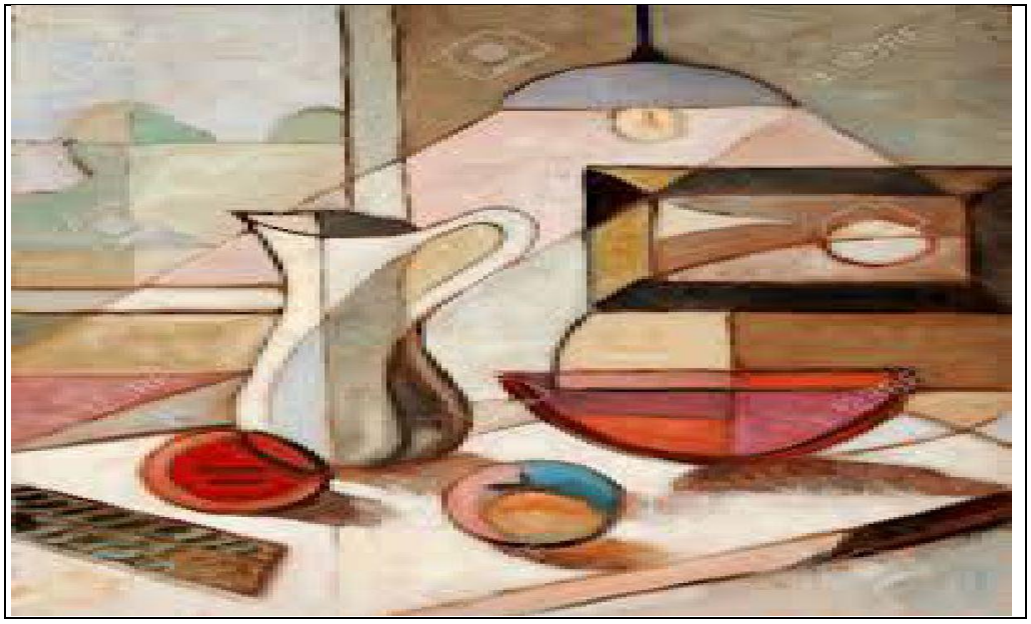

নিঃসঙ্গ

পাঠকালে কোথায় কীভাবে যে পড়েছিলাম ---
আত্মানং বিদ্ধি--- আগে নিজেকেই জানো

মনে গেঁথে গেছে। তাই আরো বেশি করে
নিজেকে জানার জন্য অধ্যয়ন চলে নিরন্তর

অনেকেই সময় পায় না। অথচ সময় আসে
আমার নিকটে। গ্রন্থের জোগান পাই নিয়মিত

প্রকৃতির পাঠে একাত্মতা রাখি। সন্ধানী মন ছোটে
মানুষের মনের গভীরে। অনেকেই সঙ্গে থাকে---

শরীরে শরীর ধাক্কাধাক্কি। এরফলে মনে মনে
অনেকে নীরস--- অনুভব করি। উপরে আওয়াজ তোলে

কেবল সৌজন্য। ছলনার ইতিবৃত্তে আমি একা
নীচে পড়ে থাকি। নির্বাচন মাথায় থাকে না।

লৌকিক বিস্ময়

আজ হাইটেক ডিজিটাল দুনিয়ায় চারিদিক

আলোকিত আলোময় অফুরন্ত আলো---
রাত্রিও দিনের মতো প্রায়।

জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সার ছেঁকে নিয়ে ব্যবহারিক
জীবনে অনেকে অলৌকিক অন্ধ-বিশ্বাসেই ভালো

ভাবে আর কাজের স্বাক্ষর রাখে কেন পশ্চাদ্‌গামিতায়!

HOME

সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা

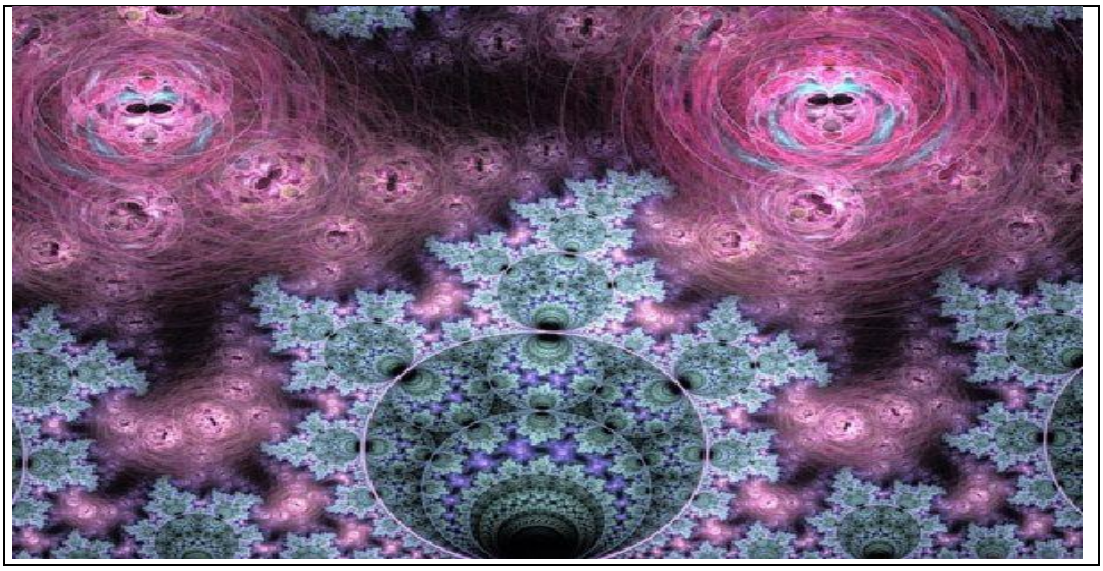

পিকনিকের কবিতা

কবিতা অনেক কিছু নিয়ে এলো -
প্রথাবিরুদ্ধ প্রেম, অপেক্ষা, দীর্ঘশ্বাস
হাসি হাসি মুখের আড়ালে ঝকঝকে লুকোনো ছুরি
প্রত্যাশা, ফিকে হতে থাকা বন্ধু-কলোনি
কলকাতার রাস্তায় আরও একা আর ফাঁকা হয়ে যাওয়া....

কবিতা অপরাধপ্রবণ রাতের মত
এনে দিল বোকা উন্মাদনা, নেশা আর নিষিদ্ধ যাতায়াত
একটানা রক্তক্ষরণের পর আরও রক্তপাত
কবিতা শূন্য ঘরের দিকে নিয়ে গেল আরও
ময়ূর-পেখম দেবে বলে, এনে দিল অপমান-প্রস্তাব

কবিতা মাথার ভেতরে সৌরঝড় এনে দিয়ে
কার্সিনোমার মত তছনছ করে দিল সব
আশ্রয় দেবে বলে, রক্তে ছড়িয়ে দিল বিষের শিকড়

তার থেকে গাছ হল, সেইসব গাছের তলায়
পিকনিক করে গেল নায়ক আর নায়িকার দল.....

HOME

ব্রতীন বসুর অণুগল্প

সুপর্ণা ভাল নেই

রোদ পড়ছে চোখে, ঘুমোতে পারছি না। পর্দাটা টেনে দেবে প্লিজ।
আমি ঘুমের ওষুধটা গুঁড়ো করে সুপের তলানিটুকুতে মিশিয়ে দিলাম।
--- এটা খেয়ে নাও।
সুপর্ণার খাওয়া শেষ হলে বাটিটা সিঙ্কে নামিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।
সামনাসামনি কোন উঁচু বাড়ি নেই। তিনতলার বারান্দা থেকে অনেক দূর অবধি দেখা যায়।
রাত প্রায় দুটো। আজ পূর্ণিমা। আকাশটা চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। গাছের কালো নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে রাস্তায় নাইটগার্ডের লাঠির ঠকঠক আওয়াজ।
জানালায় একপাশে লাগোয়া বুকশেলফ।
ঠাসা কবিতার বই বিভিন্ন ভাষায়।
সুপর্ণা কবিতায় ডুবে থাকতে ভালবাসে।
দিনের অনেকটা সময় আজকাল ও ভিজে থাকে কান্নায়। কাল্পনিকতা খেয়ে নিচ্ছে ওর অস্তিত্ব।
ডক্টর আহমেদ বারণ করেছেন সুপর্ণাকে কবিতা পড়তে।
ভাল করে বইগুলো দেখলাম। শেলি কিটস টেগোর সুনীল কি নেই। আমি বিশেষ কবিতা বুঝি না।

দেখি তাকে, একটা বই সামনের দিকে পাতাতে পেজমার্ক করা। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। অমলকান্তি রোদ্দুর হতে চেয়েছিল।
পর্দা টেনে আলো নিভিয়ে দিলাম।
কাল থেকে আরো সাবধানী হতে হবে।
বইগুলো সরিয়ে হাসিখুশি পুতুল রাখলে কেমন হয় ?

HOME

অপাংশু দেবনাথের কবিতা

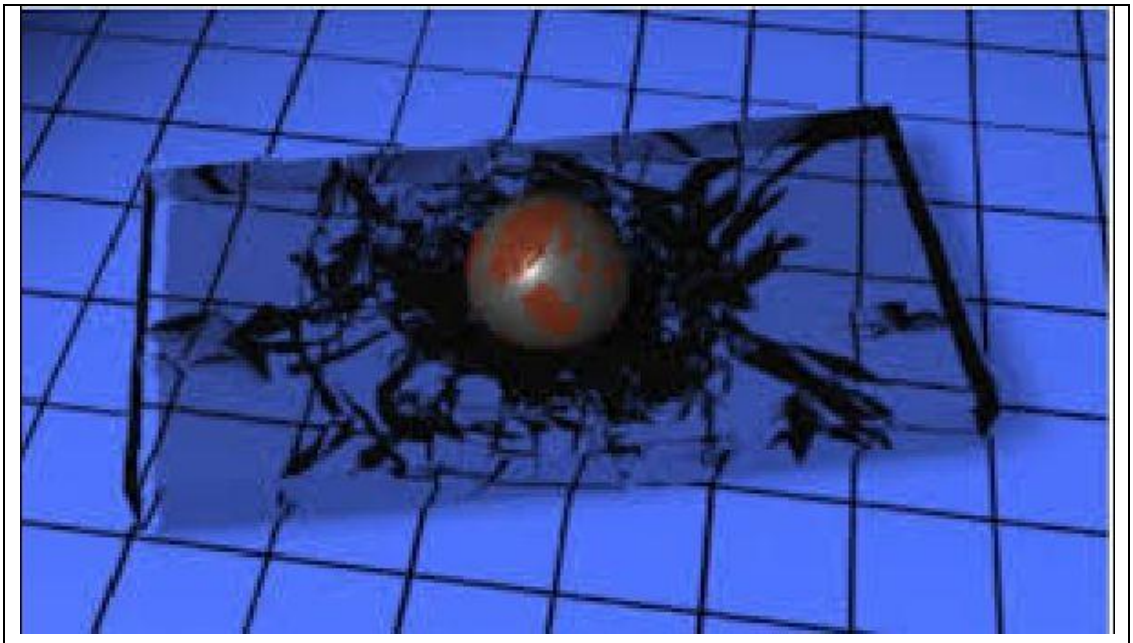

বেনে ও বাজার

মাঝে মাঝে ভাবি, প্রকৌশলী নই, ছলচাতুরী, বাজাররহস্য অজানা সবই।

সমবেত বয়কট হয়না জেনেই কেউ কেউ অপেক্ষা করে শৈত্যঘোরে দাঁড়িয়ে।
বঙ্কিম সরণি বেয়ে তুমিই একদিন মাখবে রকমারি প্রসাধনী।

তির ফসকে গেলে পাখির চোখ দেখো, বুকে জাগা প্রাণ দেখো,
আমিও তাই চেয়েছি বলেই কেউ কেউ ছবি হয়, আড়ালে চিমটি কাটে,
এতোটা ধারালো হয়নি নখ কারো, যাতে ক্ষত করা যাবে আমার পাঁজর।

ভাবি, কতোটা কাল বণিকেরা বেনেই থেকে গেলো, রক্তে বহন করে বাজার।

ছত্রিশ পংক্তিমালা

১
বিবাদে বিনয় বাড়ে, খুলে দেখে করতল কেউ,
কিছুই নেই সঞ্চিত অবশেষে অশ্রুচিহ্ন স্পষ্ট।

২
খুব বেশি ঝুঁকে গেলে লিগামেন্টে টান পড়ে জানি,
জেনেশুনে ফুল তুলি, হাতে এসে কাঁটা হয়ে যায়।

৩
ফুল ও কণ্টক তার মধ্যিখানে গরল ও সুগন্ধিতে
ভ্রমর আসে, মৌমাছি কম্পিত পাখায় ধরে রাখে সময়।

৪
শব্দকে সত্য মেনেই বিশ্বাসে নদী অঙ্কন করি বুকে,
তুমি তাতে ছিপ ফেলে ঢেউয়ে ঢেউয়ে লিখো ব্রহ্মলিপি।

৫
শিমূলরঙা ভুল ওড়িয়েছি আকাশে।
তুমি ছুঁয়েছো বলেই উড়লো নি:শব্দ পাখা মেলে।

৬
পরম আভা আমাকে জড়ায়।
অবিকল হিমশৈল ফুঁড়ে আসা উজ্জ্বল ছায়াতে।

৭
সন্ধ্যায় পাহাড়ে পরাগরেণু ঝরাও,
নেমে এসে ভোরে নদী হলে এপারে।

৮
কিছুতেই কিছু নয় হবার তার
যার অন্তর বাহির ঈশ্বরময়।

৯
সব জ্বালানি মজুত রেখো
যজ্ঞ সাজাতে হবে একদিন।

১০
বাঁ-দিকে যে চিকন বিষাদ ভেতরে ভেতরে চিবিয়ে সে
বন্ধ দরোজার খিলিঘরে অহোরাত বেঁধে রাখে শেষে।

১১
বিবাহের মরসুমে শূন্য মাঠে বিরহ কঙ্কণ বাজে
নাড়া তুলে বিকল্পবিকেলে ভিনগাঁয়ের প্রেমিকেরা আসে।

১২
পথে হেঁটে যেতে দেখি ওড়ে আঁচল কার নদী গহ্বরে
পাখি ঠোঁটে লেগে আছে সেই রাত্রির নীরব অবসাদ।

১৩
মন আমার তোমার সাথে বিন্দু বিন্দু কুয়াশা কঠিন
জল ছুঁয়ে ধোঁয়া ধোঁয়াভোর কে যেন উপনিষদ পড়ে!

১৪
চিৎমুদ্রায় জাগি বিছানায় এপাশ ওপাশে পূর্ণচন্দ্র
আলো ফেলে ধীরে যেন আমি আহত হই চাঁদলাগা ঘোরে।

১৫
নিজেকে বিজ্ঞাপিত করিনি কখনোই
বিজ্ঞাপন আমাকেই পণ্য করে তোলে।

১৬
পথে এসে সব কুয়াশারা আজকাল পেখম মেলে বসে
আলো জ্বালি মনোপাখা এসে আমাকেই জড়ায় নীরবে।

১৭

অবস্থান জেনে নিয়ে সন্ধ্যাতারা জ্বালে কেউ
দেশান্তরে ছড়ায় সে ভালোলাগা মন্ত্ররূপে।

১৮
ধুলো ধোঁয়া ছুঁয়ে হাঁটে এতো এতো চলমান অদ্ভুত সব পা।
আমি সে চরণ খুঁজি যাতে স্পর্ধায় রাখা যাবে নির্মাণ পুষ্প।

HOME

রুদ্রশংকরের দু'টি কবিতা

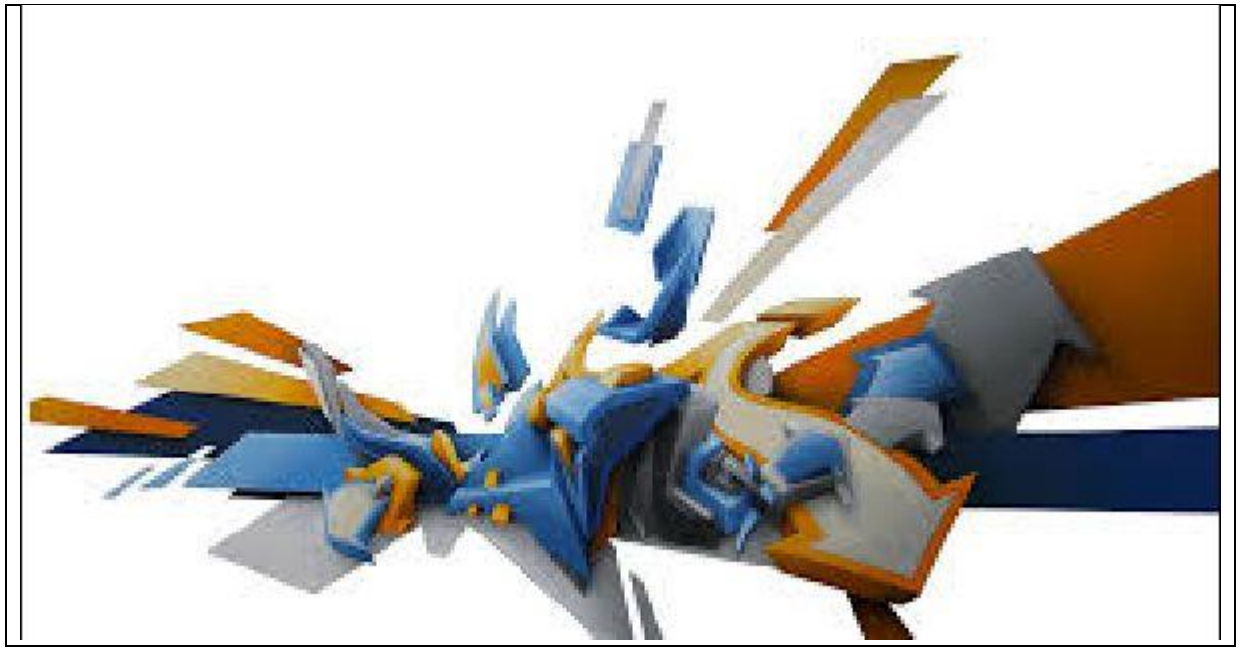

দাগ

এমন করে গুছালি, তা সত্ত্বেও বুকের ভেতরে
থেকে গেল পুরোনো চিরাগ, যা এখন নিতান্ত অচল

ওটুকুই ঈর্ষা ভরে লিখি, ওটুকুই শব্দ হয়ে ওড়ে
ওটুকুই তোর কাছে ঋণ, কবে শোধ দেব বল ?

সম্পর্ক

আলাপ সামান্য ছিল, তাতেই
চোখেতে স্পর্শ ছুঁড়ে ছিলে
ভাস্কর্য ভাঙার সেই শুরু, নিত্যদিন
পুরুষ হলাম তিলে তিলে

পরক্ষণে উড়ে যায় পাখি
প্রেম নিরাপদ নয়...
ঘর থেকে দু'পা বাড়ালেই
বন্ধুত্ব ভাঙাগড়া হয়...

HOME

তৃষ্ণা বসাকের অণুগল্প

দিদার শাড়ি কিংবা ভারতবর্ষ

দিদা মারা যাবার পর তার সব শাড়ি মেয়ে, বৌ, নাতনি, নাতবৌয়ের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিল মেজমাসি। মেজমাসি বিয়ে করেনি, দিদার শেষমুহূর্ত পর্যন্ত কাছে কাছে থেকেছে। আমার ভাগে পড়েছিল একটা সাদা শাড়ি। পুরো থান নয়, হালকা বেগুনি রঙের কলকা তোলা সরু একটু পাড়, জমিটা পুরো সাদা, দিদা পুরো সাদা পরে থাকলে মামা-মাসিদের সহ্য হত না।

সেই শাড়িটা এখন আর আস্ত নেই। সেটা থেকে মাঝেমাঝেই একফালি দুফালি করে ছেঁড়া হয়েছে। ধবধবে সাদা কাপড় কত কাজে যে লাগে। কেটে গেলে ব্যাণ্ডেজ, জল ছাঁকা, পুঁটলি করে ফুটন্ত ভাতের মধ্যে মুসুরডাল সেদ্ধ দেওয়া। দামি ক্রকারি মুছে রাখতেও এমন নরম সাদা কাপড় দারুণ উপযোগী।

তাড়াহুড়োর মাথায় নানান হাতে, নানান দরকারে কাটার জন্যে শাড়িটা শুধু ছোটই হয়নি, অদ্ভুত একটা শেপ নিয়েছে। একদিন খুব মুসুরডালসেদ্ধ খাবার ইচ্ছে হল। জিভের মধ্যে লঙ্কা পেঁয়াজ নুন তেল দিয়ে মাখা মুসুরডালসেদ্ধর স্বাদ অনুভব করতে করতে সেদ্ধ বাঁধার জন্যে রাখা সাদা

কাপড়ের টুকরোটা খুঁজছিলাম। কিচেন ক্যাবিনেটেই তো রাখা ছিল। পেলাম না। বাধ্য হয়ে আলমারি খুললাম। আবার একটা টুকরো কেটে নিতে হবে। এই তো দিদার শাড়িটা। হাতে নিয়ে চমকে উঠি, এ তো অবিকল ভারতবর্ষের ম্যাপ!

HOME

যুগান্তর মিত্রের অণুগল্প

জমিন

-- এট্টা কতা কবো?
-- বল্, শুনি।
-- কইকি, তোমার শইলটা একন ভালো যাতিছে না। সবদিন কামকাজে যাতি পারো না। কামও পাও না। অ্যামতে আর কদ্দিন চলবে ?
-- তুই কী কইতে চাস ক'তো!
-- আমি যদি মণ্ডলবাড়ি ধানঝাড়ার কাজ নিই এক বেলা, তয় ...
কথাটা শেষ করতে দেয় না পতিত। কাজ থেকে ফিরে তার সত্যিই শরীরটা আর বইছিল না। ক'দিন ধরেই এমন হচ্ছে। হাঁপ ধরে যায়। তাই বিকেলে কোনোরকমে গা ধুয়ে এসে দুটি ভাত খায়। তারপর বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। সেইসময় বউ ময়না এসে মাথার কাছে বসে। পতিত তখন মাথাটা বালিশের থেকে টেনে এসে ময়নার কোলে রাখে। আর বউ তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।
আজও তেমনই চলছিল। এমন সময় ময়নার কাজে যাওয়ার কথা শুনে মাথায় চড়াক করে রক্ত উঠে গেলো পতিতের। প্রথমে চোখ বন্ধ করে ছিল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসে বউয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

-- তরে আমি ঠিকমতো ভাতকাপড় দিতি পারি না। তা'বলি পরের ঠেনে কামে পাঠামু? তুই এ কী কস ময়না ?
-- তয় হইছে কি শুনি? আমি তো আর মলি বউয়ের মতোন ইজ্জত বেচি দিতিছি না!
-- চুপ যা ময়না। একদম বেশি কথা কবি না ক'লাম।

ময়না জানে এরপর আর কথা বাড়ালে স্বামীর হাতে চড়চাপড় খেতে হবে। গালমন্দ তো আছেই। তাই চুপ করে যায়।
পতিত বউয়ের দিক থেকে চোখ সরিয়ে খোলা দরজার আলো এফোঁড়ওফোঁড় করে উঠোনে তাকায়। উদাস সেই চাউনি নিয়ে একমনে বলে যায় কথা। যেন ময়না নয়, সে নিজেকেই বলছে।
-- কী সব উন্নতিফুন্নতি হইব বলি জমিজিরেত যেটুকুন ছেল নে নিল। ট্যাহাপয়সা যা দেল সে আর কত্টুকু? তার মদ্যি কিচু নেলো পাণ্ডারা। কিচু ট্যাহায় চাঁচড়ের ঘর ভাঙি কিচুটা ইটের দালান উটালাম। বাকি ট্যাহা কেমতে কেমতে ফুরায়ে গেলো। একন রাজমিস্ত্রির জোগালি খাটি। পইশ্রম হলিও আমি দেকি দুবেলা য্যান খাওন জোটে। কিন্তুক আমি ভাবি নাই তরে কামে পাটামু। এর মইধ্যে যদি পোলাপাইন কিচু থাকত তয় আরও আতান্তরে পড়তাম।

দেওয়ালের পেরেকে ঝোলানো জামার পকেট থেকে বিড়ি দেশলাই বের করে ধরায় আর উঠোনে নেমে আসে।

ময়না আতঙ্কিত হয়। স্বামী তার ভালোমন্দ কিছু করে ফেলবে না তো ! বোঝে সে স্বামীর মনের উপর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। গোলাভরা না-হলেও ধান কম উঠত না ঘরে। আর আজ কিচ্ছু নেই তাদের।
-- ঘরে আসো। আমি আর কুনুদিন কামকাজের কতা কবো না ক'লাম। আমার মাতা খাও। ঘরে আসো।
কিছু একটা ভেবে আধখাওয়া বিড়ি ছুঁড়ে ঘরে ঢোকে পতিত। মণ্ডলবাড়ির বাবু বড়ো ভালোমানুষ। জানে পতিত। তবু মন মানে না।

অনেক রাতে বিছানা ছেড়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় পতিত। কিন্তু ময়নার চোখেও যে ঘুম নেই সেকথা জানে শুধু ময়নাই। পা টিপে টিপে পিছু নেয় সে। পিছন পিছন পাঁচিল দেওয়া মাঠের মধ্যে ঢুকে যাওয়া পতিতকে অনুসরণ করে। অন্ধকার চিরে দুজনেই তফাতে এগোতে এগোতে মাঝমাঠে এসে দাঁড়ায়।
-- আমারে ক্ষমা করিস ময়না। আমি তর ভালো সোয়ামী হতি পারি নাই রে ময়না। ওহ্ ভগমান, আমারে উঠায়ে নাও। আমি ময়নার কাম করা দেকতি চাই না ...

আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে পতিত। ছুটে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা পতিতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ময়না।

দুই ছায়ার সেই আকুল কান্না শুনতে পায় মাটি, যা ছিল তাদের একসময়ের চাষের জমি। শুনতে পায় আকাশের তারা, অন্ধকার চরাচর। বাতাস সেই হাহাকার বহন করে চলে আপন খেয়ালে।

পিছনে পড়ে থাকে শূন্য ঘরগেরস্থালি।

HOME

সদানন্দ সিংহের অণুগল্প

মৈতে পাগলা

মনমোহন মোটর মেকানিক। সারাদিন খাটুনির মাঝে দুপুরে সে বাড়ি গিয়ে খায়। বাড়ি তার দোকান থেকে খুব একটা দূরে নয়। বাই-সাইকেলে চলে যায়। আজও সে দুপুরে গিয়ে সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে ঘরে ঢুকে সাবান দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে রান্নাঘরের দিকে যখন যাচ্ছে তখন মৈতে পাগলা তাকে একপ্রকার ধাক্কা মেরে রান্নাঘরে ঢুকে যায়। আর ঢুকেই মৈতে পাগলা টেবিলের ওপর রাখা খাবারের থালাটাকে টেনে খেতে শুরু করে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে মনমোহনের বৌ বাসন্তী একটা বাটি হাতে ফ্রীজ হয়ে চোখ বড় বড় করে মৈতে পাগলাকে দেখছে। মনমোহনের মেজাজটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। সাধ করে অনেকদিন পর সে সকালে ইলিশ কিনে এনেছিল। সে একটা বেত খুঁজে এনে তা দিয়ে পাগলটার পিঠে ঠাস করে একটা ঘা বসিয়ে দেয় জোরে। বেতের বাড়ি খেয়ে মৈতে পাগলা কঁকিয়ে বলে ওঠে, ওঃ মাগো। আমাকে খেতে দাও না। আলো-জ্যোৎস্না।

মনমোহন বেত নামিয়ে ফুঁসতে থাকে। এই পাগলটা অনেকদিন ধরে এদিকসেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। নোংরা প্যান্ট-শার্ট-দাড়ি-চুল। সবাই ওকে মৈতে পাগলা বলে ডাকে। ও নাকি বাংলাদেশের বর্ডার পেরিয়ে ঢুকেছে। মুখে তার সবসময় দুটো শব্দ শোনা যায়, সেটা হচ্ছে আলো-জ্যোৎস্না। পাগলদের

পুলিশ ধরেনা। তাই ও নিশ্চিন্তে এদিকসেদিক ঘুরে বেড়ায়। ক্ষিদে পেলে যখন তখন লোকজনের বাড়িতে ঢুকে যায়।
মনমোহন অপেক্ষা করে পাগলটার খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত। গোগ্রাসে খাচ্ছে বলে পাগলটার খাওয়া তাড়াতাড়িই শেষ হয়। তখন মনমোহন আবার বেত দিয়ে পাগলটার পিঠে জোরে আঘাত করে। পাগলটা ব্যথায় ওঃ বলে আওয়াজ করে আর মুখে শুধু বলে, আলো-জ্যোৎস্না।
এইসময় বাসন্তী বলে ওঠে, মেরো না ওকে। ছেড়ে দাও।

কেউ জানেনা, আলো এবং জ্যোৎস্না কে এবং পাগলটার সঙ্গে তাদের সম্পর্কই বা কী ?

HOME

সদানন্দ সিংহের দু'টি কবিতা

এই আমি, আমাকে

আমি কোনোদিনই হিমালয়ের নীরব সঙ্গী ছিলাম না
দুরন্ত ঈগলকেও আমি একদিন তির মেরেছিলাম
সবুজ আর মরুর গালিচায় কোনোদিন গড়াগড়িও খাইনি

তবুও আমাকে ওজন করানোর চেষ্টা হতেই
চিৎ হয়ে আমি ধপাস শুয়ে পড়লাম
হাত জোড় করে বললাম, প্লিজ লীভ মাই হোম।

এইভাবে শুয়ে শুয়ে একদিন ভীষণ সন্ধ্যায় দেখলুম
তারাগুলি লেগে আছে গাছের মাথায় পোকার মতন

তারপর এক ফিসফিসে কণ্ঠস্বর আমাকে কোন্
এক ব্লাড-ব্যাঙ্কে ঢুকিয়ে দিলে

রক্তের বিন্দু থেকে রক্তের বিন্দুতে ছুটে যেতে যেতে শুনতে পেলুম
কে যেন চেঁচিয়ে যাচ্ছে অবিরাম, অক্টোপাস অক্টোপাস

ধর্ম

সভ্যতা মানুষের চূড়ান্ত ধর্ম বলে
সভ্যতার ভেতরে এক মোমবাতি জ্বলে
জ্বলে জ্বলে শেষ হয়

শেষ হলে আবার একটি মোমবাতি জ্বলে

চাপ কমে, ঝড় হয়, ধুলো ওড়ে
সব হয় লণ্ডভণ্ড
লুটিয়ে পড়ে বট-অশ্বত্থ
লুটিয়ে পড়ে মোমবাতি
রাধার দুয়ারেই নাচে উথাল-পাথাল ঢেউ
ভেসে যায় কোন্ সে নগরের অচিন চেলা
ঘুরে ঘুরে পাক খায় প্রাণহীন লখিন্দরের মিষ্টিক ভেলা
কান ঘেঁষে ছুটে যায় এক হানাদার মিসাইল

তারপরও আবার একটা মোমবাতি জ্বলে

জ্বলে জ্বলে শেষ হয়
তারপর আবার একটা মোমবাতি জ্বলে
এক সভ্যতা থেকে আরেক সভ্যতার দিকে

HOME

অজিতা চৌধুরীর কবিতা

স্তবক ১

হংসরথে দেবীর প্রস্থান
প্রাচীন পুঁথিতে তার নির্মাণ কৌশল
দাভিনচির অঙ্কিত ছবির চেয়ে উজ্জ্বল
কোথায় হারিয়ে গেল হাজার বছর
হারিয়ে গেল আমাদের পক্ষিরাজ

স্তবক ২

মাতার মতোই আলো হাতে
সকালের রোদ
অবাক জানালায় উঁকি দিল গাছ
আজ ফুল কলি ছিল গতকাল

হলুদ লালেতে মেশানো ফুলগুলো
রং হয়ে গাঁথা শরীরে

স্তবক ৩

বুকের মধ্যে ছোট স্টেশন
প্রতিবেশী আসে
বাতাসে আলাপন
স্পর্শ পাই স্বজন মুখের

স্তবক ৪

শুরু থেকে শেষ
কতবার যে থেমেছি
আঁকাবাঁকা পথ
পূর্ণতা চান
ফুল হলাম
পাখি হলাম

HOME

ব্রতীন বসুর দু'টি কবিতা

যুদ্ধ

মা
দশ হাত
পাশে একটা অসুর
মাকেও যুদ্ধ করতে হয়
মা টিউশানি সেরে ফিরত
তারপর বাজার তোলা রান্না খাওয়াদাওয়া
খাতা দেখা দশ হাতেও রাত হয়ে যেত
আজ সত্তর এর কাছাকাছি বয়েস
এখনও অনেক অসুর
প্রেশার সুগার
থাইরয়েড
বেঁচে ।

যুদ্ধ ?
যে যুদ্ধ শেষ হয় সে পৌরাণিক নয় পুরুষের ।

বড় হবার পথে

ছেলেটা প্রথম খুন করল ষোলো বছর বয়সে
গলা টিপে বন্ধুকে,
ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল
তার ঠিক এক বছর বাদে
মাকে,
ঘুমের ওষুধ আর পাথর দিয়ে মাথায় তারপর।
বাবা ধরিয়ে দিল।
টানা দুহপ্তা কাগজে ছবি।
কি করতে পারত। কি করল না।

মায়েরা রান্না চাপাতে চাপাতে দেখল।
বাবারা অফিস যাবার আগে।
শিক্ষকরা কোচিংক্লাসে অঙ্ক দিয়ে চোখ বুলিয়ে
নিল প্রথম পাতায়।
ঘন্টাখানেক নষ্ট হল নিউজ চ্যানেল প্রতিবেদকের।

বড় হবার পথে ম্যানহোল খোলাই থাকল পড়ে।
কেউ ঢাকা দিল না।

HOME

আলোচনা

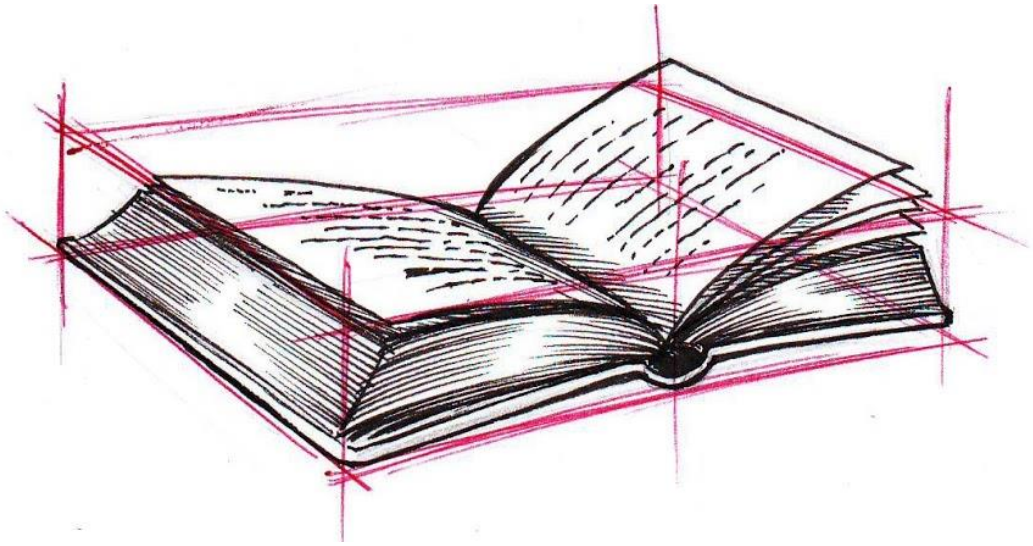

অলক দাশগুপ্তের গল্পগ্রন্থ ‘সবুজ বাগানে অলৌকিক রাতে’

অলক দাশগুপ্ত অনেকদিন ধরে গল্প লিখছেন। অনেকদিন আগে থেকেই আমি ওর গল্প পড়ছি বিভিন্ন ম্যাগ বা পত্রপত্রিকায়, কিন্তু একক সংকলন হিসেবে প্রথম এই গল্পগ্রন্থটি আমার হাতে এল। সূচীপত্রানুযায়ী ন’টা গল্পের সংকলন হওয়ার কথা, কিন্তু ভেতরে আটটি গল্প বর্তমান এবং শেয়াল নামক গল্পটি ভেতরে নেই।

এই আটটি গল্পের মধ্যে পাঁচটি গল্পের সূত্রে আছে হত্যা, আত্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা।

‘সবুজ বাগানে অলৌকিক রাতে’ গল্পে দেখি তন্ময় ও পরস্ত্রী সারিতার শারীরিক সম্পর্কের উদ্দামতা এবং তন্ময়ের আত্মহত্যার মধ্যেই গল্প শেষ হয় একটা অলৌকিক পরিস্থিতিতে যেখানে আছে এক গভীর রহস্য যা উন্মোচিত হতে কেউ পছন্দ করেনা। এই রহস্য এক প্রাকৃতিক, এই রহস্য এক শারীরিক; যার বেড়াজালে সবাই যেন বাঁধা পড়ে আছে।

‘সে আসে’ গল্পে দেখি বিয়ের আগের ভ্রূণহত্যার প্রভাব বিয়ের পরে (অন্য পুরুষের সঙ্গে) তার জীবনে কীভাবে তাকে এক মানসিক আশান্তির পরিবেশ তৈরি করেছিল এবং মনোবিদের সাহায্যে সে মুক্তি পেয়েছিল।

‘একুটি ফোন কল’ গল্পে দেখি রিটায়ার্ড অবিনাশ তার মেয়ের ফোনের জন্য অপেক্ষারত যে মেয়েকে হত্যা করা হয়েছিল।

‘অন্য সিদ্ধার্থ’ গল্পে দেখি পুত্রের জন্যে এক পিতার আত্মত্যাগ (আত্মহত্যার মাধ্যমে), যার ফলে পিতার চাকুরিটা পাবার জন্যে বি এ পাশ বেকার পুত্রের রঙিন দুনিয়ায় পদার্পণ।
‘একটি তারার কাছে’ গল্পেও দেখি এক আত্মহত্যা। ছোটো ভাইয়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বড়ভাই সন্দীপের অনুসন্ধান যা হাজার তারার ভিড়ে কোনো তারাকে খোঁজার সামিল।
‘অন্নপূর্ণা লাইন হোটেল’ গল্পটা তো একটা গোটা পরিবারের আত্মহত্যার সামিল হওয়ার গল্প যেখানে মা-বোন-ভাই সবাই একসময় যৌনকর্মী ও দালালে পরিণত হয়েছে।
এছাড়া আছে সুবল নামক এক চালচুলোহীন আহাম্মকের স্কেচ যেখানে সুবল বিশ্বাস করে – পৃথিবী তুমি বড়ো সোন্দর গো (আহাম্মকের একটি দিন) এবং সুখরামের গল্প যা সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে এক পদাঘাত (শরশয্যা)।
অলকের প্রায় প্রতিটি গল্পেই একটা গল্প থাকে। থাকে কিছু স্কেচ। চরিত্রগুলিও বেশ বুদ্ধিদীপ্ত। আছে ভাষার কারুকার্য। এই গ্রন্থের গল্পগুলি পড়ার পর গল্পগুলি পাঠকের কাছে তৎক্ষণাৎ শেষ হয়ে যায়না, রেশ হিসেবে পাঠককে ভাবিয়ে তোলে। আর এখানেই গল্পকারের সার্থকতা।
[--সদানন্দ সিংহ]
(প্রকাশকঃ অক্ষর পাবলিকেশান। দাম ১৫০.০০)
HOME

লেখাজমা

ঈশানকোণ দেয় ভাল লেখা প্রকাশের গ্যারান্টি। আপনার ভাল লেখাটি এখনই পাঠান।

লেখা পাঠাবার নিয়মাবলী

* *ইন্টারনেটের যেকোনো জায়গায় প্রকাশিত লেখা পাঠাবেন না ।*
* *বহুল প্রচারিত নয় এমন লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত লেখা পাঠানো যাবে । তবে খুব প্রচারিত এমন লিটল ম্যাগাজিন, দেশ, আনন্দবাজার সহ অন্যান্য কমার্শিয়াল পত্র- পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা পাঠাবেন না। তবে নতুন লেখাই কাম্য ।*
* *যেকোনো লেখা পাঠাতে পারেন । চিত্রকলা, এমন কি ভ্রমণকাহিনিও।*
* *লেখা পাঠালে ধরে নেওয়া হবে সমস্ত নিয়ম মেনেই আপনার মৌলিক লেখাটি পাঠাচ্ছেন ।*
* *লেখা মনোনীত হলে ইমেল-এর মাধ্যমে দুমাসের ভেতর জানিয়ে দেয়া হবে যদি লেখক। লেখিকার ইমেল-এর ঠিকানা দেয়া থাকে ।*
* *লেখা অভ্র বাংলা কিবোর্ড দিয়ে লিখে ইমেল-এর মাধ্যমে পাঠাবেন ।*
* *ভাল লেখা এলে নতুন বিভাগ খোলা যেতে পারে।*
* *লেখা নির্বাচনের ব্যাপারে সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ।*
* *লেখা* WORD *বা* OPEN OFFICE *ফাইলে পাঠাবেন,* PDF *বা অন্য ফাইলে পাঠাবেন না। এছাড়া ইমেলের বডিতে লিখেও পাঠাতে পারেন।*
* *অমনোনীত লেখাগুলি লেখক-লেখিকাকে জানিয়ে দেওয়া যেতে পারে ইমেল এর মাধ্যমে।*
* *আপাতত বছরে চারটি সংস্করণ* FEB-MARCH, MAY-JUNE, AUG-SEPT *ও* NOV-DEC *নাগাদ বেরুবে। আগামী সংখ্যার জন্য আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন এখনই । স্কেচ সহ পারলে পাঠান।*
* *ইমেল-এর মাধ্যমে লেখা পাঠাবার ঠিকানাঃ—*singhasada@gmail.com
* *লেখা ফেসবুকে ইনবক্সে নিম্নলিখিত লিংকেও পাঠাতে পারেনঃ--*

https://www.facebook.com/sadananda.singha.9

* *এছাড়া আলোচনার জন্যে পত্র-পত্রিকা পাঠাতে পারেন নিচের ঠিকানায়ঃ--*

পদ্মা সিংহ

C/O- *নন্দালয়, লাইফড্রপ ওয়টার প্ল্যান্টের পেছনে,*

অভয়নগর, আগরতলা। PIN-799005

[*লেখক-লেখিকাদের প্রতি একান্ত অনুরোধ লেখা পাঠিয়েই ঈশানকোণ প্রকাশের আগে সেই পাঠানো লেখাটি ইন্টারনেটের যেকোনো জায়গায় নিজে বা অন্যের মাধ্যমে প্রকাশ করবেন না দয়া করে*]

HOME

কবিতা

অরিন্দম ভাদুড়ীর কবিতা

উপলব্ধি

ঘৃণা কোরো না, ওতে ভোলা যায় না।
বরং, গঙ্গার ঘাটে চলো
রাতগুলি গুটিয়ে নাও গোড়ালির ওপর,
ছোট ছোট ঢেউ চুমো দিক পায়ের পাতায়।

এবার বলোতো, কিসের ঘৃণা ?
না পাওয়ার ? পেয়েছিলে তো !

হারিয়ে ফেলার ? স্বেচ্ছায় তো !

অসুখী থাকার ?

পায়ের পাতায় এসে জড়াবে একটুকরো কচুরিপানা,
যত্ন করে তোলো।
আগাছা সরিয়ে আদর করে কোলে রাখো,
পড়ন্ত বিকেলের কমলা আলোয় তাকাও, ভাসিয়ে দাও ওকে
কোলের থেকে। বিসর্জন...

অনুভূতিটা রয়ে গেলো, ভালোলাগার।

পরেরবার তা বলে আগাছা হয়ো না, একসাথে ভাসার আশায় !

দু-পিঠে

এসো একটু অন্যভাবে খেলি।

এই ক'বছরে বেশ মাখামাখি হলো,
হাতের কাছে যা যা পেয়েছি, হাতড়ে মাখিয়েছি...

চড়, থাপ্পড়, স্পর্শ, আদর, লোভী লালা, চুমো, সিঁদুর !
এবার একটু কাদা মাখানো যাক।

একটা সাদা কাগজ দিলাম তোমায়, শর্ত
দু পিঠে দুজনে বিপরীতধর্মী শব্দ লিখবো।

তুমি লিখলে 'ঘেন্না'...

HOME

কবিতা

সন্তোষ রায়ের পাঁচটি কবিতা

বাঘ বেরুলো বনে

এক

পরিত্যক্ত জুমে এসো, টংঘরে করি রাত্রিবাস
উদগ্র নেশা আছে নিবিড় বনে
প্রিয় পাত্রে ঢেলে দেব নিঃশব্দের গান।
তারপর শিকারির দল অরণ্য ছেড়ে যাবে
বন্দুক ফেলে,
ফেলে যাওয়া বন্দুকের নলে
তুমি আর আমি দেখে যাব চাঁদ

ভালবাসার কলঙ্কসখী

এভাবেই দেখে সারারাত।

দুই

ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে একটু ভাবো
নিভে যেন না যায় কামনার আলো
অরণ্য শান্ত বড়ো, তেমনি কোমল
চুলে কাটো বিলি, লুকাও অন্তরে।

মনে মনে ডাকছে যত ফুটন্ত ফুল
তার ঘ্রাণে তুমিও পাগল হলে
ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে একটু ভাবো
হৃদয় না ভাঙে যেন অতীব প্রেমে।

বিনিময়

যদি জানতে চাও আমার মূল্য কত
নিঃশব্দে থাকব
যদি বল – এই হাতের দাম
নিঃশব্দ থাকব
এই চোখ, বুক, মাথা
কোনো শব্দ-ই করবো না
বাজার ঘুরে বারবার ফিরে ফিরে আসবে জানি,
পসারে সাজানো শরীরটা দেখবে স্বপ্নের মতন।

আমার নিঃশব্দতা তোমাকে
বিরক্ত করবে
বিরক্ত করবে

আর বিরক্ত করবে
গল্পটা ডেকে ডেকে বলবে মানুষকে
ওরা শুনবে, মুচকি হেসে চলে যাবে
মনে মনে বলবে – পাগল।

কে পাগল!
আমি পাগল হ'লেও কোনো শব্দ করবো না
কোনো মূল্যেই শব্দ করবো না
কোনো শব্দে নিজেকে বিকাবো না

হে পাঠক,
নিঃশব্দে দিয়েছি সব –

গ্যাপ

মাঝরাত সরে যায়
আরেকটু সরে
আরেকটু ...
আরেকটু ...

একটা গ্যাপ
চালা থেকে কুয়াশা পড়ে টুপটাপ

কী যন্ত্রণা!
টয়লেটে চলে যায় মন
এভাবেই গ্যাপ তৈরি হয় নিজের সাথে

মাঝরাতে ফিরেও তাকায় না
যেতেই থাকে বাড়ি থেকে নেমে
পথ পেরিয়ে

মাঠ পেরিয়ে
কুয়াশার সান্ত্বনা মেখে

আমার ঘুমন্ত দেহটি পড়ে থাকে একা এখানে

অনুকথন

এক
এমন কথা বলব না আর মুখে
ইহনদীর স্রোতধারা উপচে পড়ে বুকে।

দুই
নিঃশব্দে লিখে চলি যত রুদ্ধশ্বাস
দূষিত জলবায়ু আর অন্ধ মহাকাশ।

তিন
ডুবে আছি।
অন্ধকারে উড়ল পাখি

কে আমি!
-- ডানার ঝটপটানি

সামুদ্রিক

উনুনটা কাত হয়ে পড়ে আছে। ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় যেন সন্ধ্যা।
আমি কি পারি বসিয়ে দিতে ঠিক দুপুরে!

সমুদ্রের কত আনাচ-কানাচ, কত খাদ্যের বহর, মস্ত পরিবার।
ভাসতে-ডুবতে হয় সকলের মাঝে, ফেনাগুলো তেড়ে আসে পাহাড় বিক্রমে

কী আর কুড়োই বলো নিজেকে ছাড়া ?
আমি-ই আয়, আমি-ই ব্যয়, শূন্য জালে পড়ে জল হয়ে যাই—
এদিকে তাকালে ওই পাড় দেখা যায়।

উনুনটা কাত হয়ে গেছে কয়লা ফুরোবার আগেই। এক বালতি
আগুন গলে গলে পড়ছে জলে

তীরের মানুষ ডাকে দূরের মানুষকে
সন্ধ্যার হাঁস যেমন ডাকে গৃহিনী
দূরের নৌকো যেন চাঁদের কলা।
মনে মনে বলি – পারাপারহীন ডুবছি আমরা
জীবনের ভেতর সংসার এক তিমি।

HOME

চয়ন ভৌমিকের কবিতা

ডেথ মেটাল

ছোটো হয়ে গেল পৃথিবীটা।
চেপেচুপে প্রাচ্য, পাশ্চাত্য – চতুর্দিকের লাল কালো
ভরে দিলাম কাগজের প্যাকেটে।
রাজা রাণীরা রাজত্ব করছে সেখানে মহা আনন্দে।
পোশাকে নম্বর লিখে তাদের ঘিরে রেখেছে
মুচি থেকে রাজপুরোহিত।

তারপর যেই তাদের বার করে বেঁটে দিলাম হাতে হাতে বন্দুক
কী ধুন্ধুমার যুদ্ধ তাদের নিজেদের মধ্যে।
রক্তক্ষয়, জমিদখল, গ্যাসচেম্বার, রিফিউজি ক্যাম্প
অনুপ্রবেশ আর শিশুহত্যা কী নেই।

পিটের পর পিট সাজাচ্ছি আমরা আর
সাদা হাড়ের পাহাড় উঁচু হয়ে উঠছে।

এর মধ্যেই মাঝে মাঝে যুদ্ধবিরতি
বাজারঘাট, কারখানা, ভাঙাবাড়ি মেরামত করে নেওয়া।

এ এক জাদুখেলা চলছে
নেশার ঘোরে এভাবেই তৈরী করছি ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন –
লুকিয়ে রাখছি পরমাণু টেক্কা

কারণ আমরা জানি আমাদের তুরুপের রঙ
- নাগাসাকি হিরোশিমা।

HOME

অভ্রদীপ দত্তের কবিতা

প্রিয় রাজলক্ষ্মী

বেশ কয়েকদিন ধরেই ভাবছিলাম তোকে একটা ফোন করব,
নয়ত লালকলমে এক চিঠির পাতায় কিছু কষ্ট ভরব;
কিন্তু সময় হয়ে ওঠেনি রে!
দেখতে দেখতে একান্নবছর পার হল,
কৈশোর থেকে যৌবন, যৌবন থেকে বার্ধ্যক্য গড়াল;
ব্যস্ততার অজুহাত দিয়ে একলা একলা নিশিযাপন,
যাক সেসব কথা; যত্তসব দু:খের কাহন।
আগে বল, কেমন আছিস ? চিনতে পারলি ?
রোগামত দেখতে, একসাথে মিশন স্কুলে পড়তাম,
স্কুলভ্যানে পাশাপাশি বসে তোকে লক্ষ্মীপাগলী বলে ডাকতাম।
হ্যাঁ, ঠিক ধরেছিস। নক্ষত্র দত্ত, ১৮/১ আলিপুর, ফরিদপুর।
বলছি, ঐ আগের মতো নাক দিয়ে জল পড়ে তোর?

এখনো বকুলফুল কানে গুঁজে আয়না দেখিস?
এখনো কি ফোকলা দাঁতে হাসতে হাসতে,
চুল টানলে ভ্যাঁদভেঁদিয়ে কাঁদতে থাকিস?
রাগ করলি? ঠিক আছে আর বলবো না।
জানিস, সৈকতের সাথে হঠাৎ সেদিন নাগপুরে দেখা হল,
সুন্দর ফর্সা মুখখানি দেখলাম ঢাকা পরেছে চাপদাড়িতে।
বিশাল হোটেল ব্যবসা, এখন সেটেল করেছে ঐ তালসারিতেই।
গগনটা এখন স্কুল টীচার, স্বপন পালিয়েছে বিলেতে,
তারেক একটা ক্লিনিক খুলেছে, ব্যস্ত থাকে ডাক্তারিতে।
পৌলমীটাই পোড়াকপালী, স্বামী খুইয়েছে কালরাতিতেই
ভাবলাম দেখে আসি, শেষে সান্ত্বনা পাঠিয়েছি খোলা চিঠিতেই।
অলক, মৈনাক, তনিমারা সব ভালোই আছে, তোর কথা প্রায়ই বলে
ভালোটা শুধু আমিই নেই রে, অন্ধকারের অন্তরালে।
বুঝলি লক্ষ্মী, আজ বাবার কথাটা খুব মনে পড়ছে
সুগার মিলে চাকরি করত, দেড়শো টাকা বেতন পেত।
আমাদের মুখে খাবার দিয়ে লোকটা শুতো আধপেটে।
টাকার দায়ে দিনের শেষেও ঘাম ঝরাতো রাত্রিতে।
তারপর এলো এক কালরাতি, কালব্যাধির কি প্রবাহ!
প্রবল জ্বরে বাপটা গেলো। শোকে গেলেন মাও।
তারপর আর বলবো কিরে, দিদিই হল জীবনখনি,
মায়ের মতোই করল বড়, সম্বল বলতে দু'শতাংশের ভিটেখানি।
হঠাৎ একদিন দিদির বুকে যৌবনের ঢেউ আসলো ধেয়ে,
বিয়ে দিয়ে করলেম বিদায়, ঐ দুই শতাংশের বিনিময়ে।
তারপর? তারপর থেকে ভালোই আছি রে লক্ষ্মী,
সম্পর্কের সংজ্ঞা ভুললাম, স্বাধীন করলাম রক্ত।
ঝিনুকের খোলে বন্দী হয়েও মুক্তা যেমন মুক্ত।
তারপর যখন কলেজে পড়ি, মেসে থাকতাম কলকাতাতে,
হঠাৎ একদিন দিদির চিঠি, দিদি কাঁদছেন কবিতাতে।
"কিরে ভাই, আছিস কেমন? মনে পড়ে তোর দিদির কথা?
অনেক কথা জমে আছে রে, আয়না একদিন, করনা দেখা।

জানিস তোর কথা খুব মনে পড়ে রে যখন বৃষ্টি পড়ে পুকুর পাড়ে,
ঐ শালুক যখন শরীর ভেজায় রেললাইন এর দুধার ধরে।
আঁধার রাতে মেঘের নাদে যখন মুখ গুঁজতিস বুকের ভাঁজে,
ভাইরে, জানিস তোর ঐ দিদি ডাকটা আজও বাজে কানের মাঝে।
আজও শিম-বেগুনটা রাঁধতে গেলে চোখে আসে যে জল
মনে পড়ে? শিমের বীচি খাওয়ার কত বায়না করতিস বল?
ভাই, তোর একটা ভাগ্নে হয়েছে, নাম রেখেছি অন্তু
শীতের ছুটিতে না এলেও মামাভাতে আসিস কিন্তু!
ইচ্ছে করেরে ভাইরে আজও তোকে চোখের কাছে রেখে
আলুপোস্ত, লাউচিংড়ি, ছ্যাঁচড়া খাওয়াব রেঁধে''।

না, আর দেখা হয়নি দিদির সাথে, খাওয়া হয়নি পোস্তবাটা
দুর্ভাগ্য আর অভিমানে কতবার যে পড়েছি বাঁধা।
শেফালির চলে যাওয়ার পর দুবার টেলিগ্রাম পেয়েছি অন্তর
একটা দিদির বৈধব্যের, আরেকটা মৃত্যুর।
ততদিনে শুকিয়ে গেছে চোখের জল, বাঁধন পড়েছে পথ চলায়,
একে একে সকল স্মৃতি দাফন পড়েছে বুকের তলায়।
লক্ষ্মী, জানিস আমার আবার ঐ ছোট্টবেলায় ফিরে যেতে বড্ড ইচ্ছে করে,
ইচ্ছে করে ছেঁড়া ডায়েরির পাতাগুলো উল্টেপাল্টে দেখি
নতুন করে গহীন রাতে পুরনো দিনের চিত্রগুলি আঁকি।
মনে পড়ে ঐ পদ্মানদী, ঐ ফড়িং ধরার বিকেলবেলা?
সেথায় আজও বাতাস বয়, হাসিখুশি আর প্রাণখোলা?
এখনো আছে ঐ বটগাছটা? ঐ স্কুলের পাশের দোকানটাতে?
টিফিন-ফাঁকে আচার খেতাম, তুই আর আমি আট আনাতে?
আজও তোর বাড়িরই উঠোনটাতে, জোনাকি নাচে সন্ধ্যাবেলা?
আজও তোদের চাল ধুয়ে যায়, পূর্ণিমার ঐ জ্যোৎস্নামালা?
এখনো কি শীতের মেলায় গরুর গাড়ি চেপেই যাস?
এখনো কি বৃষ্টি হলে কাঁচা মাটির গন্ধ পাস?
জানিস আজ খুব মনে পড়ছে তাদের কথা, শৈশবের যত মালাগাঁথা,
খাঁ পাড়ার মাঠ, আয়নাল চাচার ফুলুরি, প্রতিমদের আমপোড়া,

কীভাবে সেথায় যাবো বল? ওটা তো আজ বাংলাদেশ, কাঁটাবেড়ায় মোড়া।
একটা কাজ করতে পারবি? পাঠাতে পারবি স্মৃতিগুলো?
পাঠাতে পারবি মাটির গন্ধ, জোনাকি মাখা সন্ধ্যাগুলো?
পাঠাতে পারবি আমের ভেঁপু, শিশিরকণার চকমকানি?
পাঠাতে পারবি, কুয়াশা রাতে ঝিঁঝিঁ পোকার ঘ্যানঘ্যানানি?
আরও আছে কনকচাঁপা, মাধবীলতার সুরভিটা?
পারলে পাঠাস নদীর বুকে সুর্যোদয়ের আদিখ্যেতা।
মনে করে পাঠাস কিন্তু।
বেলা হয়েছে, যেতে হবে, রইল শুধু আবদারটুকু।
ইতি - নক্ষত্র দত্ত ওরফে নীতু।

HOME